বাংলা

ভাষাপাঠ

পঞ্চম শ্রেণি

सत्यमेव जयते

বিদ্যালয় শিক্ষা-দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
ডি কে ৭/১, বিধাননগর,
সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

বিদ্যালয় শিক্ষা-দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২

কলকাতা - ৭০০ ০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, note, meaning, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৪

দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৫

পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৬

পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০১৭

মুদ্রক

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদ-এর কথা

নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণির বাংলা ভাষাপাঠ প্রকাশিত হলো। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯-এই নথিদুটিকে অনুসরণ করে নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়েছে। প্রথাগত ব্যাকরণচর্চার বদলে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের অভিমুখ ও পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বইটিকে শিশুকেন্দ্রিক এবং মনোগ্রাহী করে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ বইটি প্রস্তুত করতে প্রভূত শ্রম অর্পণ করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত পাঠ্যবই প্রকাশ করে সরকার-অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করে। এই প্রকল্প রূপায়ণে নানাভাবে সহায়তা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন। বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী মানুষের মতামত আর পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

মার্চ, ২০১৭
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

মানিক ভট্টাচার্য
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক - এর পর্যালোচনা,পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক রচিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি।

তৃতীয় শ্রেণির 'পাতাবাহার' -এর মধ্যেই ছিল ভাষাপাঠ অংশটি। চতুর্থ শ্রেণিতে স্বতন্ত্র বই হিসেবে 'ভাষাপাঠ' প্রকাশিত হয়েছিল। এবার সেই ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হলো পঞ্চম শ্রেণির 'ভাষাপাঠ'। প্রথাগত ব্যাকরণচর্চা থেকে আমাদের এই 'ভাষাপাঠ' ভিন্ন পথ অনুসরণ করেছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতির উপর নির্ভর করে আমরা চেষ্টা করেছি ব্যাকরণচর্চার অভিমুখের পরিবর্তন আনতে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন,পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মার্চ, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন, ষষ্ঠ তল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা মিথুন নারায়ণ বসু

অপূর্ব সাহা স্বাতী চক্রবর্তী ইলোরা ঘোষ মির্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

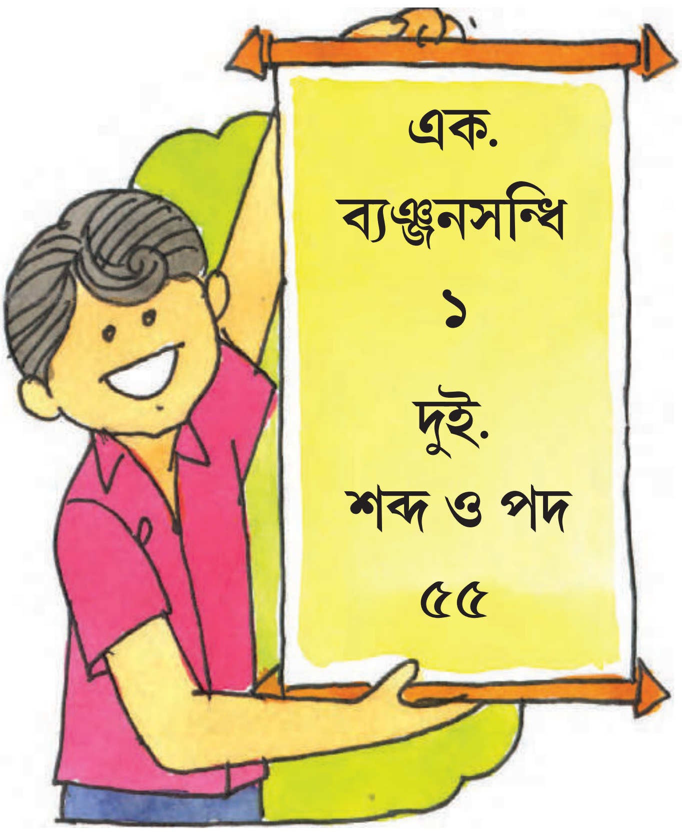

এক. ব্যঞ্জনসন্ধি ১

দুই. শব্দ ও পদ ৫৫

তিন. লিঙ্গ ৭৮

চার. বচন ৯০

পাঁচ. পুরুষ ১০৭

ছয়. চিঠিপত্র ১১৮

সাত. বিপরীত শব্দ ১৩৭

আট. অনুচ্ছেদ রচনা ১৫৩

শিখন পরামর্শ ১৬৫

ব্যঞ্জনসন্ধি

ক্লাসে ঢুকে দেখি ফার্স্ট বেঞ্চে বসা নিয়ে একটা ছোটোখাটো গৃহযুদ্ধ বেধে গেছে। আমাকে দেখে সবাই চুপ করে গেল। রাহুল আর তৌফিক ব্যাগ-হাতে তখনও দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওদের দিকে নজর না দিয়ে সন্ধ্যাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘সন্ধি’ কী, মনে আছে তোমার?

সন্ধ্যা বলল, দুটো আলাদা ধ্বনি পাশাপাশি থাকলে তাদের একজন, কিংবা দুজনেই বদলে যায়। উচ্চারণের সুবিধার জন্য জিভ এইরকম করে। আর এইভাবে বদলে গিয়ে ধ্বনিদুটো মিলে গেলে হয় সন্ধি।

ফারুক বলল, যুদ্ধের সময় যেমন দুই পক্ষের রফা হয়, বলেছিলেন আপনি।

আমি হেসে বললাম, বাঃ! বেশ মনে আছে দেখছি। তা এই ক্লাসরুমে তোমরাও তো আলাদা আলাদা ধ্বনির মতো সব আলাদা আলাদা মানুষ। ধ্বনিরা যেমন মিলেমিশে থাকে, প্রয়োজনে সন্ধি করে নেয়, তোমাদেরও তেমন করা উচিত।

গোটা ক্লাস চুপ করে আছে, তৌফিক আর রাহুল দাঁড়িয়ে। আমি বলে চললাম, রোজ একই জায়গা থেকে ক্লাস রুমটাকে দেখলে সেটা তো পুরোনো আর বাসি হয়ে যাবে। নতুন নতুন জায়গায় বসলেই তো ব্যাপারটা বেশি আনন্দের। অন্তত

আমার তো তাই মনে হয়। আর এমন অনেকে আছে সারা বছর ক্লাস করেও তাদের সঙ্গে অনেকের হয়তো বন্ধুত্বই হয়নি। রোজ একজায়গায় বসলে অবশ্য এমনটাই হবার কথা।

আমি চুপ করতেই ইয়াসমিনা তড়াক করে উঠে বলল, আমি থার্ড বেঞ্চে চলে যাচ্ছি, রাহুল আর তৌফিক, দুজনেই ফার্স্ট বেঞ্চে বসতে পারিস।

ইয়াসমিনাকে আজ অবধি ফার্স্ট বেঞ্চে ছাড়া কেউ কখনো কোথাও বসতে দেখেনি। ক্লাসে ও প্রায়ই সবার আগে চলে আসে। তৌফিকরা বসে পড়ল। ইয়াসমিনাও থার্ড বেঞ্চের এক কোনায় গিয়ে বসল। গোটা ক্লাস তখনও বিস্ময়ে চুপ।

আমি যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে বললাম, বেশ, তাহলে আজ কথা বলা যাক ব্যঞ্জনসন্ধি নিয়ে। সন্ধির মূল ব্যাপারটা তোমাদের মনে আছে দেখা গেল। উচ্চারণের সুবিধা। দুটো

আলাদা উচ্চারণস্থানের ধ্বনি পাশাপাশি থাকলে জিভ সব সময়েই চেষ্টা করে ধ্বনি দুটোকে পালটে একরকমের করে নিতে। কখনও একটা ধ্বনির প্রভাবে অন্য ধ্বনি তার মতো হয়ে যায়। কখনও দুটো ধ্বনিও পালটে যায়। স্বরধ্বনির মতো ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটে। সুতরাং, স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির, কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির মিলে যাওয়াকেই বলে ব্যঞ্জনসন্ধি।

সবাই বেশ মন দিয়ে শুনছিল, এবার মাথা নেড়ে সায় দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা ! বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণস্থান আর সেই অনুসারে তাদের নাম তোমাদের মনে আছে তো?

সবাই সমস্বরে 'হ্যাঁ, হ্যাঁ'— বলে আমাকে আশ্বস্ত করল। কাকে বলে স্পর্শধ্বনি আর

উষ্মধ্বনি, কিংবা ঘোষ-অঘোষ আর অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ? অন্তঃস্থ ধ্বনি কোনগুলি আর পার্শ্বিক অথবা তাড়িত ব্যঞ্জনই বা কোন ধ্বনিগুলো?

গুটিকয়েক প্রশ্ন করে ক্লাসের বিভিন্ন কোনা থেকে সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল। ব্যঞ্জনসন্ধি শিখবার পক্ষে আবহাওয়া অনুকূল বলেই মনে হচ্ছে। আমি বললাম, আবারও বলছি, আমাদের ভাষার শব্দভাণ্ডারের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ। বর্তমানে অনেকক্ষেত্রে তাদের উচ্চারণ বদলে গেলেও বানানবিধি কিন্তু সংস্কৃত অনুযায়ী-ই থেকে গেছে। সন্ধির নিয়মও তাই। সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়মের ক্ষেত্রে এই কথাটা অনেক সময় মনে রাখা জরুরি।

সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি :

আমি বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

প্র + ছায়া = ____________

স্ব + ছন্দ = ____________

শাবানা বলল, প্রথমটা কি 'প্রচ্ছায়া' হবে? আমি ওর তারিফ করতেই কৌশিক বলল, আর পরেরটা নিশ্চয়ই 'স্বচ্ছন্দ' হবে, না? আমি হেসে মাথা নাড়লাম। বললাম, ঠিক তাই। স্বরধ্বনির পর 'ছ্'-ধ্বনি থাকলে তা বদলে 'চ্ছ্' হয়ে যায়।

বোর্ডে গিয়ে এবার লিখলাম,

আ + ছাদন = ____________

পরি + ছেদ = ____________

তরু + ছায়া = ____________

ইন্দ্রনীল বলল, আ + ছাদন = আচ্ছাদন

রুমি বলল, পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ

অপু বলল, তরু + ছায়া = তরুচ্ছয়া।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই উদাহরণগুলোর মধ্যে মিল কোথায়?

তৌফিক বলল, এদের প্রত্যেকের শেষ শব্দ শুরু হচ্ছে ‘ছ্’ দিয়ে।

ইয়াসমিনা বলল, আর প্রথম শব্দ শেষ হচ্ছে কোনো-না-কোনো স্বরধ্বনি দিয়ে। আর সবক্ষেত্রেই সন্ধির পর 'চ্ছ্' হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।

আমি প্রকাশ্যে তারিফ না করে পারলাম না। বললাম, বেশ, তাহলে সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধির প্রথম সূত্রটা লিখে ফেলা যাক।

'অ' কিংবা অন্য স্বরধ্বনির পরে 'ছ্' থাকলে, 'ছ্' বদলে 'চ্ছ্' হয়ে যায়। অর্থাৎ স্বরান্ত ধ্বনিটি উচ্চারণের সুবিধার কারণে নিজেকে হলন্ত ধ্বনিতে পালটে নেয়। 'ছ্' ধ্বনির অল্পপ্রাণ রূপ 'চ্'-কে এনে 'চ্ছ্' -রূপে 'ছ্' ধ্বনির দ্বিত্ব করা হয়।

এইরকম আরও কিছু উদাহরণ,

প্র + ছদ = প্রচ্ছদ	আ + ছন্ন = আচ্ছন্ন
মূল + ছেদ = মূলচ্ছেদ	বি + ছেদ = বিচ্ছেদ

সূত্র ১.

অ + ছ্ = অচ্ছ্	ই + ছ = ইচ্ছ্
আ + ছ্ = আচ্ছ্	উ + ছ্ = উচ্ছ্

এইবার দেখা যাক, স্বরধ্বনি পরে থাকলে কী হয়।—আমি বললাম।

বোর্ডে লিখলাম,

দিক্ + অন্ত = ____________

প্রাক্ + উক্ত = ____________

বাক্ + ঈশ্বরী = ____________

প্রাক্ + ঐতিহাসিক = ____________

কৌশিক বলল, প্রথমটা ‘দিগন্ত’ হবে, রাবেয়া বলল, পরেরটা কি ‘বাগীশ্বরী’ হবে? রাহুল বলল,

তৃতীয়টা হবে ‘প্রাগুক্ত’ আর শেষেরটা নিশ্চয়ই হবে ‘প্রাগৈতিহাসিক’। আমি হেসে বললাম, সব একদম ঠিক বলেছ দেখছি, তা কী দেখা যাচ্ছে এই উদাহরণগুলো থেকে?

অভী বলল, ‘অ’, ‘ঈ’, ‘উ’, ‘ঐ’-এর জন্য ‘ক্’-গুলো পালটে ‘গ্’ হয়ে যাচ্ছে।

ওয়াজিদ বলল, ‘অ’, ‘ঈ’, ‘উ’ বা ‘ঐ’ আবার ওই ‘গ্’-এর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

ঠিক কথা, আমি বললাম, ‘ক্’ আর ‘গ্’ -এর মধ্যে মিল কোথায়? কৃশানু বলল, দুজনেই ক-বর্গের। মীনা বলল, দুজনেই অল্পপ্রাণ ধ্বনি। ঠিক বলেছ। আর অমিল কোথায়?--- আমি জিজ্ঞেস করলাম।

অভিষেক বলল, ‘ক্’ অঘোষ, কিন্তু ‘গ্’ ঘোষ ধ্বনি।

খুব ভালো, আমি খুশি হয়ে বলি, সুতরাং দেখা যাচ্ছে পরে থাকা স্বরধ্বনির কারণে অঘোষ ‘ক্’-ধ্বনি পালটে ঘোষ ‘গ্’ ধ্বনির রূপ নিচ্ছে। এই ঘটনাকে বলা হয় ‘ঘোষীভবন’।

একইভাবে,

নিচ্ + অন্ত	=	নিজন্ত
সৎ + আশয়	=	সদাশয়
ষট্ + আনন	=	ষড়ানন
সৎ + ইচ্ছা	=	সদিচ্ছা
মৃৎ + অঙ্গ	=	মৃদঙ্গ
সৎ + উদ্দেশ্য	=	সদুদ্দেশ্য
তৎ + ঊর্ধ্ব	=	তদূর্ধ্ব

এখানে সবক্ষেত্রেই দেখা যাবে বর্গের প্রথম ধ্বনির পরে স্বরধ্বনি থাকায় সন্ধির সময় বর্গের

প্রথম ধ্বনিটি ঘোষীভবনের ফলে বর্গের তৃতীয় ধ্বনির রূপ নিচ্ছে।

সূত্রটা লেখা যাক, স্বরধ্বনি পরে থাকলে বর্গের প্রথম ধ্বনির জায়গায় বর্গের তৃতীয় ধ্বনি হয়। স্বরধ্বনিটি বর্গের এই তৃতীয় ঘোষ ধ্বনিটির সঙ্গে যুক্ত হয়।

সূত্র ২.

ক্ + অ = গ	চ্ + অ = জ
ক্ + ঈ = গী	ট্ + আ = ড়া
ক্ + উ = গু	ত্ + অ = দ
ক্ + ঐ = গৈ	ত্ + আ = দা

ত্ + ই = দি

ত্ + ঈ = দী

ত্ + ঊ = দূ

একইরকমভাবে ‘ত্’-এর পর ‘গ্’ বা ‘ঘ্’ থাকলে ‘ত্’ বদলে ‘দ্’ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ঘোষীভবন ঘটে থাকে।

বোর্ডে লিখলাম

ভগবৎ + গীতা = ভগবদ্‌গীতা

সৎ + গ্রন্থ = সদ্‌গ্রন্থ

উৎ + ঘাটন = উদ্‌ঘাটন

সূত্রটাও একই সঙ্গে লিখে দিলাম।

সূত্র ৩. ত্ + গ = দ্‌গ | ত্ + ঘ = দ্‌ঘ

এইবার দেখা যাক আর একরকমের নিয়ম। আমি বললাম, তারপর বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

উৎ + চারণ = ____________

চলৎ + চিত্র = ____________

স্নিগ্ধা বলল, প্রথমটা ‘উচ্চারণ’ হবে। অ্যালেক্স বলল, পরেরটা হবে ‘চলচ্চিত্র’। আমি দুজনকেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। তারপর বললাম, এখানে দেখা যাচ্ছে ‘ত্’ আর ‘চ্’ — এই দুটো ব্যঞ্জনের মধ্যে লড়াইয়ে ‘চ্’-এর জিত হয়েছে। দুটো পাশাপাশি থাকা আলাদা ব্যঞ্জন যদি মিশে একটাই ব্যঞ্জন হয়ে যায় তখন তাকে সমীভবন বা ব্যঞ্জন সংগতি বলে। এখানেও অনেকটা তাই ঘটছে, ‘ত্’ বদলে ‘চ্’ হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি দুটো ‘চ্’-এর দ্বিত্ব হচ্ছে। ‘ত্’-এর জায়গায় ‘দ্’ হলেও একই হবে।

বোর্ডে লিখলাম,

বিপদ্ + চিন্তা = বিপচ্চিন্তা

সবাই মাথা নেড়ে সায় দিল। আমি এবার লিখলাম,

উৎ + ছল = ____________

উৎ + ছেদ = ____________

মাফুরা বলল, ‘উচ্ছল’। শুভদীপ বলল, দ্বিতীয়টা নিশ্চয়ই ‘উচ্ছেদ’। আমি বললাম, হ্যাঁ। দেখতেই পাচ্ছ, ‘ত্’-এর পর ‘ছ্’ থাকলে ‘ছ্’-এর দ্বিত্ব হচ্ছে, ‘ছ্’-এর সঙ্গে তারই অল্পপ্রাণ রূপ ‘চ্’ যুক্ত হয়ে এখানে দ্বিত্ব হচ্ছে। সুতরাং, একত্রে সূত্রগুলো লিখলে দাঁড়ায়।

সূত্র ৪.

ত্ + চ্ = চ্চ্	ত্ + ছ্ = চ্ছ্
দ্ + চ্ = চ্চ্	

একইরকমভাবে,

সৎ + জন = সজ্জন

বিপদ্ + জাল = বিপজ্জাল

উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল

বিপদ্ + জনক = বিপজ্জনক

এখানেও দেখো, ব্যঞ্জন সংগতির প্রভাব রয়েছে। — আমি বলি। ‘ত্’ বা ‘দ্’-এর পর ‘জ্’ থাকলে ‘ত্’ বা ‘দ্’ পালটে ‘জ্’ হয়ে যাচ্ছে আর পরের ‘জ্’-এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। পরে যদি ‘জ্’ না থেকে ‘ঝ্’ থাকত তাহলেও এমনটাই হতো।

বোর্ডে লিখলাম, কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা

এখানেও দেখো, ‘ত্’-এর পর ‘ঝ্’ থাকলেও ‘ত্’ বদলে ‘জ্’ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সূত্র হিসেবে লেখা যায়,

সূত্র ৫.

ত্ + জ্ = জ্জ্	ত্ + ঝ্ = জ্ঝ্
দ্ + জ্ = জ্জ্	

একইরকমের আরও একটা নিয়ম শেখা যাক। — আমি বললাম।

বোর্ডে লিখলাম,

তৎ + টীকা =তট্টীকা

উৎ + ডীন = উড্ডীন

বৃহৎ + ঠক্কুর = বৃহট্‌ঠক্কুর

বৃহৎ + ঢক্কা = বৃহড্‌ঢক্কা

আমি বলি দেখো, এখানেও সমীভবন বা ব্যঞ্জনসংগতির প্রভাব রয়েছে, ‘বৃহট্‌ঠক্কুর’ আর ‘বৃহড্‌ঢক্কা’ শব্দদুটোয় খুদেরা ততক্ষণে খুবই মজা পেয়েছে। এ ওকে ডাকছে ওইসব বলে। আমি একটু গলা খাঁকরালাম। এতে কাজ হলো। সূত্রটা এই ফাঁকে লিখে দিলাম। ক্লাসও নজর ফেরাল বোর্ডে।

সূত্র ৬.

ত্‌ + ট = ট্ট	ত্‌ + ঠ = ট্‌ঠ
ত্‌ + ড = ড্ড	ত্‌ + ঢ = ড্‌ঢ

আমি এবার বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

বিদুৎ + বেগ = ____________

উৎ + ভিদ = ____________

শ্রীমৎ + ভগবৎ = ____________

শংকর বলল, মাঝেরটা ‘উদ্ভিদ’ হবে। মৌমিতা বলল, শেষেরটা হবে ‘শ্রীমদ্‌ভগবৎ’। আমার দাদু ‘গীতা’ পড়েন, আমি এই শব্দটা আগে দেখেছি। আমি ওদের প্রশংসা করে বললাম, আর প্রথমটা হবে—

বোর্ডে লিখলাম, বিদ্যুৎ + বেগ = বিদ্যুদ্‌বেগ

তাহলে কী দেখা গেল? — আমি প্রশ্ন করি। খানিকক্ষণ ভেবে অভী বলল, শেষে ‘ব্’ বা ‘ভ্’ থাকলে সামনের ‘ত্’ বদলে ‘দ্’ হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক বলেছ, — আমি বলি। তারপর আবার বলি, এখানেও ঘোষীভবন হচ্ছে, দেখতে পেলে কি? দৃপ্তা বলল, হ্যাঁ, তাই ‘ত্’ গুলো ‘দ্’ হয়ে যাচ্ছে।

বেশ, সূত্রটা লিখে ফেলা যাক। ‘ব্’ বা ‘ভ্’ পরে থাকলে বর্গের প্রথম ধ্বনির জায়গায় বর্গের তৃতীয় ধ্বনি হয়। ঐ ধ্বনি পরবর্তী ‘ব্’ বা ‘ভ্’-এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

সূত্র ৭.

ত্ + ব্ = দ্ব্	ত্ + ভ্ = দ্ভ্

এবার বোর্ডে লিখলাম,

চিৎ + ময় = চিন্ময়

মৃৎ + ময় = মৃন্ময়

উৎ + মেষ = উন্মেষ

এখানে কী দেখা যাচ্ছে? --- আমি জিজ্ঞেস করলাম। তাজদার বলল, পরে 'ম্' আছে বলে 'ত্' গুলো সব 'ন্' হয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, খুব ঠিক। কিন্তু আগের সূত্রের মতো 'দ্' না হয়ে 'ন্' হচ্ছে কেন, কে বলবে?

কেউ কোনো উত্তর দিচ্ছে না দেখে আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, 'ন্' বা 'ম্' কী জাতীয় ধ্বনি?

ইয়াসমিনা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, বুঝতে পেরেছি। 'ম্' নাসিক্যধ্বনি বলে সামনের 'ত্'-কে বদলে আর একটা নাসিক্যধ্বনি 'ন্' হয়ে যেতে হচ্ছে।

আমি খুব খুশি হলাম। ঠিকই তো, আমি বলি, নাসিক্যধ্বনি 'ম্'-এর প্রভাবেই 'ত্' হয়ে যাচ্ছে 'ন্', এই ঘটনাকে বলা হয় 'নাসিক্যীভবন'।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে সূত্রটা হবে, 'ম্' পরে থাকলে বর্গের প্রথম ধ্বনির জায়গায় বর্গের পঞ্চম ধ্বনি হয়। ঐ ধ্বনি পরবর্তী 'ম্'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

সূত্র ৮. ত্ + ম্ = ন্ম্

সমীভবন হয়, এমন আর একটা উদাহরণ দিই, বললাম আমি। তারপর বোর্ডে লিখলাম,

উৎ + লাস = ____________

উৎ + লেখ = __________

তারেক বলল, প্রথমটা হবে 'উল্লাস'। আর পরেরটা 'উল্লেখ' হবে। — বলল অপালা। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম, তারপর সূত্র লিখলাম।

সূত্র ৯. ত্ + ল্ = ল্ল্

এর পর লিখলাম,

উৎ + হত = ____________

উৎ + হার = ___________

উৎ + হৃত = __________

কোরক বলল, উৎ + হত = উদ্ধত হবে মনে হচ্ছে। আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে বলল, কারণ বলতে পারব না, কিন্তু উচ্চারণ করতে গেলেই 'দ্ধ্' এসে যাচ্ছে।

আমি বললাম, ঠিকই বলেছ। এখানেও ঘোষীভবনের পদ্ধতি আছে। তবে এখানে 'ত্' বা 'হ্' — কোনও ধ্বনিই অবিকৃত থাকেনি। দুইয়ে মিলে 'দ্ধ্'-র চেহারা নিয়েছে। এই ধরনের সমীভবন বা ব্যঞ্জনসংগতিকে বলে অন্যোন্য সমীভবন।

সৌমিক বলল, বাকি দুটো তাহলে নিশ্চয়ই ‘উদ্ধার’ আর ‘উদ্ধৃত’ হবে, তাই না? আমি হেসে বললাম, ‘ত্’-এর জায়গায় ‘দ্’ থাকলেও এক ঘটনা ঘটত। বোর্ডে লিখলাম,

পদ্ + হতি = পদ্ধতি

তারপর সূত্রটাও লিখে দিলাম।

সূত্র ১০.

ত্ + হ্ = দ্ধ্	দ্ + হ্ = দ্ধ্

এর পর বোর্ডে লিখলাম,

উৎ + শ্বাস = ______________

চলৎ + শক্তি = ______________

উৎ + শ্বসিত = ______________

উৎ + শৃঙ্খল = ______________

জয়ন্ত বলল, প্রথমটা মনে হয় ‘উচ্ছ্বাস’ হবে। আমি হ্যাঁ বলাতে আবার বলল, আর দ্বিতীয়টা হবে ‘উচ্ছ্বসিত’।

রাবেয়া বলল, তৃতীয়টা হবে ‘চলচ্ছক্তি’। রতন বলল, শেষেরটা বোধ হয় ‘উচ্ছৃঙ্খল’ হবে, না?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম এখানেও দেখো, অন্যোন্য সমীভবনের প্রভাব দেখতে পাবে। ‘চ্’ আর ‘ছ্’ কেমন ধ্বনি?

‘তালব্য ধ্বনি’। — সবাই বলে উঠল।

ঠিক কথা।—আমি বললাম। তালব্য-শ্ আছে বলে দন্ত্যধ্বনি ‘ত্’ বদলে তালব্য ধ্বনি ‘চ্’-এর রূপ নিচ্ছে। ‘শ্’ হয়ে যাচ্ছে ‘ছ্’। তাহলে সূত্রটা লিখে ফেলা যাক,

সূত্র ১১. ত্ + শ্ = চ্ছ্

এই রকমের আরও একটা নিয়ম শিখে ফেলা যাক।—আমি বললাম। তারপর বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

যাচ্ + না = যাচ্ঞা	যজ্ + ন = যজ্ঞ রাজ্ + নী = রাজ্ঞী

এখানেও দেখো, চ-বর্গের যে-কোনো তালব্য ধ্বনির পরে নাসিক্য দন্ত্যধ্বনি 'ন্' থাকলে তাকে তালব্য অথচ নাসিক্য 'ঞ্' ধ্বনিতে পালটে ফেলা হচ্ছে।

সূত্র ১২. চ্ + ন্ = চ্ঞ্ | জ্ + ন্ = জ্ঞ্

একইরকমভাবে মূর্ধন্য ধ্বনি 'ষ্'-এর পরে 'ত্' বা 'থ্' থাকলে তাদের পালটে যথাক্রমে মূর্ধন্য ধ্বনি 'ট্' ও 'ঠ্' করে নেওয়া হয়।

বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

বৃষ্ + তি = বৃষ্টি
ষষ্ + থ = ষষ্ঠ

তারপর সূত্র লিখে দিলাম।

সূত্র ১৩.

ষ্ + ত্ = ষ্ট্	ষ্ + থ্ = ষ্ঠ্

ব্যঞ্জনসন্ধির খেলায় সবাই বেশ মেতে উঠেছে দেখা গেল।

আমি বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

দিক্ + নির্ণয় = দিঙ্‌নির্ণয়
বাক্ + ময় = বাঙ্‌ময়

তারপর বললাম, ১২নং সূত্রের মতো এখানেও দেখো, 'ক্'-এর পর 'ন্' বা 'ম্' নাসিক্যধ্বনি

থাকলে ‘ক্’ নিজেও পালটে হয়ে যাচ্ছে নাসিক্যধ্বনি ‘ঙ্’। এক্ষেত্রেও নাসিক্যীভবন হতে দেখছি।

তারপর বোর্ডে লিখলাম,

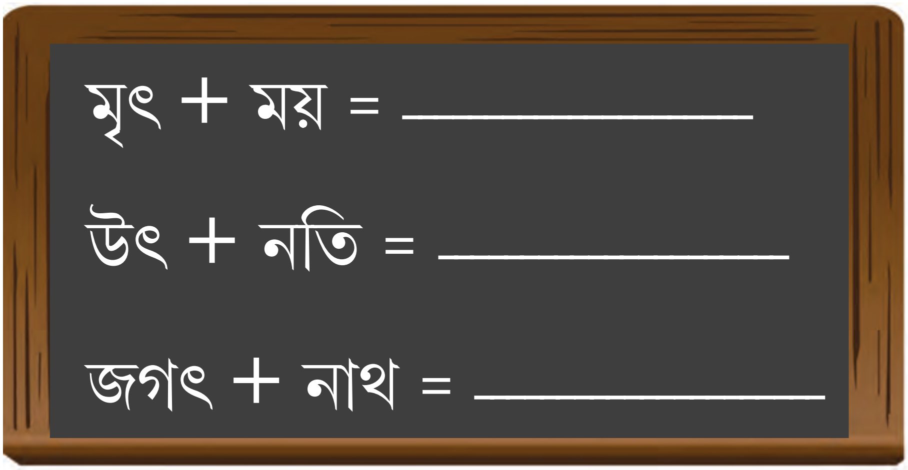

রাকিব বলল, প্রথমটা হবে ‘মৃন্ময়’। নাতাশা বলল, পরেরটা হবে ‘উন্নতি’। জীবন বলল, শেষেরটা নিশ্চয়ই ‘জগন্নাথ’ হবে। আমি মাথা নেড়ে বললাম, শেষে থাকা নাসিক্যধ্বনি ‘ন্’ বা ‘ম্’-র এর জন্য প্রথমে থাকা ‘ত্’, বদলে নিজের বর্গের নাসিক্যধ্বনি ‘ন্’-এর রূপ নিচ্ছে। ‘ত্’-এর জায়গায় ‘ধ্’ থাকলেও একই ব্যাপার ঘটবে।

বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

ক্ষুধ্ + নিবৃত্তি = ক্ষুন্নিবৃত্তি

তারপর সূত্র লিখে দিলাম,

সূত্র ১৪.

ক্ + ন্ = ঙ্ন্	ত্ + ন্ = ন্ন্
ক্ + ম্ = ঙ্ম্	ত্ + ম্ = ন্ম্
	ধ্ + ন্ = ন্ন্

বোর্ডে এরপর লিখলাম,

উৎ + স্থান = উত্থান

উৎ + স্থিত = উত্থিত

উৎ + স্থাপন = উত্থাপন

এই উদাহরণগুলো থেকে কী বুঝলে, বলো দেখি।— আমি প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম। তৌফিক বলল, ‘স্’ ধ্বনিটাকে হারিয়ে যেতে দেখছি।

আমি বললাম, একদম ঠিক। এই ব্যাপারটাকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ। তারপর সূত্রটা লিখে দিলাম,

সূত্র ১৫. ত্ + স্থ্ = থ্

এইবার বোর্ডে ডাকলাম সন্ধ্যা আর নাসিরকে।

ওরা বোর্ডে লিখল,

তদ্ + ত্ত্ব = ____________

হৃৎ + কম্প = ____________

হৃৎ + পিণ্ড = ____________

তদ্ + পর = ____________

নাসির বলল, তৃতীয়টা নিশ্চয়ই 'হৃৎপিণ্ড' হবে। আমি হ্যাঁ বলায় সাহস পেয়ে বলল, দ্বিতীয়টা হবে 'হৃৎকম্প'। সন্ধ্যা বলল, শেষেরটা হবে 'তৎপর'। আর প্রথমটা হবে 'তত্ত্ব'।— আমি বললাম। কী দেখলে?— আমি জিজ্ঞেস করি। জাহানারা বলল, 'দ্'-এর পরে 'ক্', 'ত্' বা 'প্' থাকলে 'দ্' বদলে 'ত্' হয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম, ঠিক। 'দ্' বা 'ধ্'-এর পরে ক-বর্গ, ত-বর্গ ও প-বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় ধ্বনি থাকলে 'দ্' বা 'ধ্' পালটে হয়ে যায় 'ত্' [ৎ]।

সেই কারণেই,

ক্ষুধ্ + কাতর = ক্ষুৎকাতর

ক্ষুধ্ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা

এখানে দেখতে পাচ্ছ ঘোষীভবনের উলটো প্রক্রিয়া। ‘ক্’/‘খ্’, ‘ত্/থ্’ বা ‘প্’/‘ফ্’-এর মতো অঘোষ ধ্বনির প্রভাবে ঘোষ ধ্বনি ‘দ্’/‘ধ্’ বদলে অঘোষ ‘ত্’-ধ্বনির রূপ নিচ্ছে। একে বলা যায়, অঘোষীভবন। এরপর সূত্রটাও লিখে দিলাম,

সূত্র ১৬.

দ্ + ক্ = ৎক্	ধ্ + ক্ = ৎক্
দ্ + ত্ = ত্ত্	ধ্ + প্ = ৎপ্
দ্ + প্ = ৎপ্	

এরপর বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

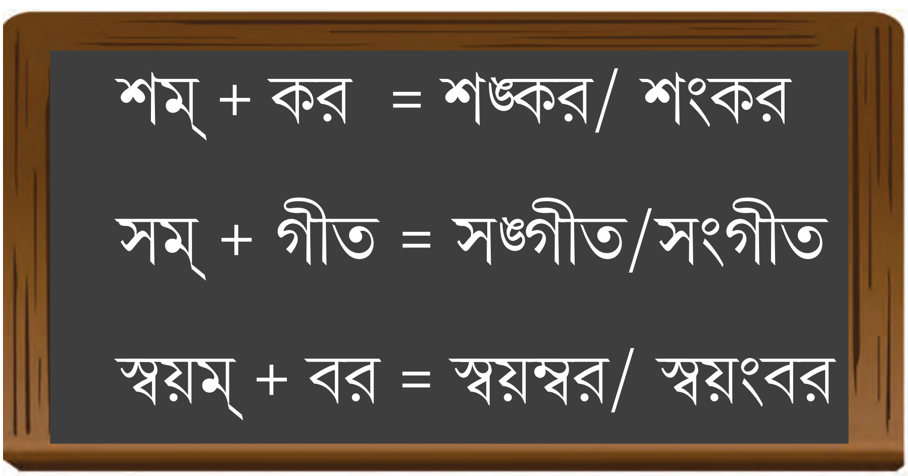

সম্ + চিত = সঞ্চিত

পরম্ + তপ = পরন্তপ

আমি বললাম, পূর্বপদের শেষে থাকা 'ম্' কীভাবে বদলে যাচ্ছে দেখো। প্রথম দুটো উদাহরণে শেষের পদদুটি শুরু হয়েছে 'ক্'-বর্গের ধ্বনি 'ক্' আর 'গ্' দিয়ে। 'ম্' তাই বদলে ক-বর্গের নাসিক্য ধ্বনি 'ঙ্'-এর রূপ নিয়েছে।

পাপড়ি বলল, তৃতীয় উদাহরণে 'চ্' আছে বলে 'ম্' বদলে হয়ে যাচ্ছে 'ঞ্'।

রাহুল বলল, তার পরেরটায় 'তপ'-র 'ত্'-এর জন্য 'পরম্'-এর 'ম্' হয়ে যাচ্ছে 'ন্'।

হ্যাঁ, আর শেষের উদাহরণে প-বর্গের ওষ্ঠ্যধ্বনি 'ব্'-এর কারণে 'স্বয়ম্'-এর 'ম্'-কে আর বদলাতে হচ্ছে না।— আমি বলি।

কিন্তু আপনি শব্দগুলোকে 'ং' দিয়ে লিখেছেন কেন?— তনিমা জিজ্ঞেস করল।

কেননা দুটো বানানই ব্যাকরণগতভাবে ঠিক। — আমি বলি। তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। যেমন,

শম্ + ত = শান্ত

যাই হোক, আপাতত সূত্রটা লিখে ফেলা যাক —

স্পর্শধ্বনি পরে থাকলে পদের অন্তস্থ ম্-স্থানে 'ং' বা বর্গের পঞ্চম ধ্বনি হয়।

সূত্র ১৭.

ম্ + ক্ = ঙ্ক্, ংক	ম্ + চ্ = ঞ্চ্
ম্ + গ্ = ঙ্গ্, ংগ	ম্ + ত্ = ন্ত্
	ম্ + ব্ = ম্ব্, ংব

এইবার বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

সম্ + কার = সংস্কার	পরি + কার = পরিষ্কার
সম্ + কৃত = সংস্কৃত	পরি + কৃত = পরিষ্কৃত

পড়ুয়াদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, উদাহরণগুলো থেকে কী জানতে পারলে বলো দেখি।

শ্রীমন্তী বলল, ‘স্’ বা ‘ষ্’ চলে আসতে দেখছি।

আমি বললাম, ঠিক কথা। একে বলা হয় ব্যঞ্জনাগম। খালি খেয়াল রাখো, ‘পরি’-র শেষে থাকা উচ্চস্বরধ্বনি ‘ই’-র কারণে ডানদিকের উদাহরণগুলিতে মূর্ধন্যধ্বনি ‘ষ্’-এর আগমন ঘটছে। তারপর সূত্র লিখে দিই —

সূত্র ১৮.

[সম্] ম্ + কা = স্কা	[পরি] ই + কা = ষ্কা
ম্ + ক্ = স্ক্	ই + কৃ = ষ্কৃ

এরপর বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

সম্ + যম = সংযম	সম্ + বাদ = সংবাদ
সম্ + রাগ = সংরাগ	সম্ + সার = সংসার
সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন	সম্ + হার = সংহার

প্রশ্ন করলাম, এই উদাহরণগুলো থেকে কী নজরে পড়ল তোমাদের? রেবতী বলল, 'ম্'-গুলো সব 'ং' হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। আমি বললাম, হচ্ছেই তো। আসলে 'য্' আর 'ব্'-এর মতো অন্তঃস্থ ধ্বনি, 'র্' আর 'ল্'-এ মতো তরল ধ্বনি এবং 'শ্', 'ষ্', 'স্', 'হ্'-এর মতো উষ্মধ্বনি পরে

থাকলে পদের শেষে থাকা ‘ম্’ পাল্টে ‘ং’ হয়ে যায়।

সূত্রটা লিখলে দাঁড়াবে,

সূত্র ১৯.

ম্ + য্ = ংয্	ম্ + ব্ = ংব্
ম্ + র্ = ংর্	ম্ + স্ = ংস্
ম্ + ল্ = ংল্	ম্ + হ্ = ংহ্

সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়ম প্রায় সবই শেখা হয়ে গেছে। আমি বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

বাক্ + জাল = বাগ্‌জাল

বাক্ + দত্তা = বাগ্‌দত্তা

বাক্ + বিস্তার = বাগ্‌বিস্তার

সপ্রশ্ন ভঙ্গিগতে চাইতেই হাফিজুল বলল, সবকটা ‘ক্’-ই বদলে গিয়ে ‘গ্’ হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক বলেছ।— আমি বললাম। আসলে বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ ধ্বনি (ঘোষ ধ্বনি) অথবা ‘য্’, ‘র্’, ‘ল্’, ‘ব্’, ‘হ্’ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত বর্গের প্রথম ধ্বনিটি পালটে বর্গের তৃতীয় ধ্বনি হয়ে যায়। এখানে যেমন ‘ক্’ হয়েছে ‘গ্’।

একইভাবে,

উৎ + ভব = উদ্ভব	ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র
উৎ + যম = উদ্যম	

এখানেও ঘোষীভবনের প্রক্রিয়া কাজ করল।

সূত্রটাও লিখে ফেললাম—

সূত্র ২০.

ক্ + জ্ = গ্জ্	ত্ + ভ্ = দ্ভ্
ক্ + দ্ = গ্দ্	ত্ + য্ = দ্য্
ক্ + ব্ = গ্ব্	ট্ + য্ = ড়য্

আর আছে কিছু নিপাতনে সিদ্ধ সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি। ‘নিপাতনে সিদ্ধ’ — কথার অর্থ মনে আছে নিশ্চয়ই?

ইয়াসমিনা বলল, হ্যাঁ, যেসমস্ত শব্দকে ব্যঞ্জনসন্ধির কোনো নিয়মের আওতায় ফেলা যাবে না, কিন্তু ব্যাকরণের দিক থেকে শব্দগুলো ভুল নয় — এদেরকেই নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি বলতে হবে।

বেশ! আমি বলি, এবার এইরকম কয়েকটা সন্ধির উদাহরণ দেওয়া যাক।

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি :

তৎ + কর = তস্কর [ত্ + ক্ = স্ক]

আ + চর্য = আশ্চর্য [আ + চ্ = শ্চ]

বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি [ত্ + প্ = স্প]

গো + পদ = গোষ্পদ [ও + প্ = ওষ্প্]

বন + পতি = বনস্পতি [ন্ + প্ = নস্প্]

দিব্ + লোক = দ্যুলোক [ব্ + ল্ = যুল্]

খাঁটি বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি :

এইবার খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যঞ্জনসন্ধির কতগুলি নিয়ম শিখব। বুঝতেই পারছ, বাংলার নিজস্ব উচ্চারণরীতি অনুসারে এখানে সন্ধির নিয়ম সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধির সঙ্গে অনেকক্ষেত্রেই মিলবে না। এই সন্ধিবদ্ধ পদগুলি মৌখিক উচ্চারণে হরদম বলা হলেও সব পদ কিন্তু লেখা যায় না। যেমন, আমরা প্রায়ই বলে থাকি— মেঘ + করেছে = মেক্‌করেছে কিন্তু লেখার সময় মোটেই ওইভাবে

লিখি না। তবে, ঘোড়া + সওয়ার = ঘোড়্সওয়ার -এর মতো অনেক সন্ধিবদ্ধ পদের ক্ষেত্রে মৌখিক আর লিখিত রূপ মিলেমিশে গেছে।

বোর্ডে গিয়ে লিখলাম,

ছোট্ + দি = ছোড়্দি	রাত্ + দিন = রাদ্দিন
এত্ + দূর = এদ্দূর	বট্ + গাছ = বড়্গাছ
পাঁচ্ + জন = পাঁজ্জন	চাক্ + ভাঙা = চাগ্ভাঙা

এখানেও দেখো, ‘ছোড়দি’ শব্দটার লিখিত রূপ ব্যবহার হলেও বাকিগুলির ক্ষেত্রে তা হয় না। এইখানেও দেখো, ঘোষীভবনের নমুনা দেখা যাচ্ছে। সূত্র করে লিখলে হয়, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম ধ্বনি অথবা ‘য্’, ‘র্’, ‘ল্’, ‘ব্’, ‘হ্’ পরে থাকলে বর্গের প্রথম ধ্বনির জায়গায় তৃতীয় ধ্বনি হয়।

সূত্র ১.

বর্গের তৃতীয় ধ্বনি/
বর্গের চতুর্থ ধ্বনি/
বর্গের প্রথম ধ্বনি + বর্গের পঞ্চম ধ্বনি/
= বর্গের তৃতীয় ধ্বনি
য্/ র্/ ল্/ ব্/ হ্

এর উলটো পদ্ধতিও ঘটে। অর্থাৎ খাঁটি বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধিতে অঘোষীভবনের নমুনাও রয়েছে।

বোর্ডে লিখলাম,

বড়ো + ঠাকুর = বট্ঠাকুর

আধ্ + খানা = আৎখানা

রাগ্ + কোরো না = রাক্কোরোনা

সূত্র করে লিখলে দাঁড়ায়, বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি পরে থাকলে তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনির জায়গায় সেই বর্গের যথাক্রমে প্রথম আর দ্বিতীয় ধ্বনি হয়।

সূত্র ২.

বর্গের তৃতীয় ধ্বনি + বর্গের প্রথম ধ্বনি/বর্গের দ্বিতীয় ধ্বনি = বর্গের প্রথম ধ্বনি

বর্গের চতুর্থ ধ্বনি + বর্গের প্রথম ধ্বনি/বর্গের দ্বিতীয় ধ্বনি = বর্গের দ্বিতীয় ধ্বনি

পড়ুয়ারা দেখলাম ভুরু কুঁচকে ব্যাপারস্যাপার বোঝার চেষ্টা করছে। আমি ওদের কিছুটা সময় দিলাম। সবাই ধাতস্থ হবার পর বোর্ডে লিখলাম,

পাঁচ্ + সের = পাঁশ্‌সের ।

পাঁচ্ + সিকে = পাঁশ্‌সিকে

তারপর বললাম, ‘চ্’-এর পরে ‘শ্’, ‘ষ্’, ‘স্’ থাকলে ‘চ্’ বদলে ‘শ্’ হয়।

সূত্র ৩. চ্ + শ্ / ষ্ / স্ = চ্ > শ্

‘চ্’ নিয়ে আরো মজা দেখা যায়। — আমি বলি, বোর্ডে গিয়ে লিখি,

জুয়া + চোর = জোচ্চোর

অর্থাৎ, ‘চ্’ পরে থাকলে আগের স্বরধ্বনিটি লোপ পায় আর এই ক্ষতি মেটানোর জন্য ‘চ্’-এর দ্বিত্ব ঘটে।

সূত্র ৪. স্বরধ্বনি + চ্ = চ্চ্

চ-বর্গেরই আর একটা নিয়ম দেখো। আমি আবার বোর্ডে যাই।

দুধ্ + জ্বাল = দুজ্জাল

হাত্ + জোড়া = হাজ্জোড়া

বদ্ + জাত = বজ্জাত

ভাত্ + জল = ভাজ্জল

নাতি + জামাই = নাজ্জামাই

কী দেখতে পাচ্ছ? --- আমি ক্লাসকে প্রশ্ন করলাম। ব়ুমি বলল, সবকটা শুরুর শব্দই শেষ হচ্ছে ত-বর্গের ধ্বনি দিয়ে। সৌরভ বলল, আর শেষের শব্দগুলো শুরু হচ্ছে ‘জ্’, মানে চ-বর্গের ধ্বনি দিয়ে। আমি বললাম, ঠিক বলেছ। সূত্রটা

লিখে ফেলা যাক এবার। চ-বর্গ পরে থাকলে তার আগের ত-বর্গ নিজেও বদলে গিয়ে চ-বর্গ হয়ে যায়।

সূত্র ৫. ত - বর্গ + চ - বর্গ = ত - বর্গ > চ - বর্গ

কুন্তল জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়মে যেমন ধ্বনিলোপের নমুনা দেখলাম, বাংলায় তেমন নেই?

আমি বললাম, আছে তো, সূত্র-৪-এই তো স্বরধ্বনি লোপের নমুনা দেখলে। তবে আরো উদাহরণ আছে। বোর্ডে গিয়ে লিখলাম—

কাঁচা + কলা = কাঁচ্‌কলা

ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়্‌দৌড়

মিশি + কালো = মিশ্‌কালো

টাকা + শাল = টাক্‌শাল

ভরা + দুপুর = ভর্‌দুপুর

সারি + বন্দি = সার্‌বন্দি

পিসি + শাশুড়ি = পিস্‌শাশুড়ি

খুড়ো + শ্বশুর = খুড়্‌শ্বশুর

সাধারণত ব্যঞ্জনধ্বনি পরে থাকলে আগের স্বরধ্বনিটি প্রায়ই লোপ পায়।

সূত্র ৬. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি = স্বরলোপ

একইভাবে ব্যঞ্জনলোপও হয়। — আমি বলি। বোর্ডে গিয়ে লিখলাম—

ঘর্‌ + জামাই = ঘজ্জামাই

ঘোড়ার্‌ + ডিম = ঘোড়াড্ডিম

চার্‌ + টি = চাট্টি

মার্‌ + না = মান্না

কর্ + তাল = কত্তাল

হর্ + তাল = হত্তাল

ব্যাটার্ + ছেলে = ব্যাটাচ্ছেলে

দূর্ + ছাই = দুচ্ছাই

কী দেখতে পাচ্ছ? — আমি প্রশ্ন ছুড়ি।

আরমান বলল, সবকটা ক্ষেত্রেই প্রথম শব্দটা শেষ হয়েছে 'র্' দিয়ে।

বর্ণালি বলল, সন্ধির পর 'র্' লোপ পেয়েছে আর পরের ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব হয়েছে।

আমি ওদের তারিফ না করে পারলাম না। বললাম তার সঙ্গে এখানে সমীভবনের বিষয়টাও খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু। সূত্র করে লিখলে পাই,

সূত্র ৭.

র্ + ব্যঞ্জনধ্বনি = র্ লোপ + ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব

সমীভবনের আর একটু নমুনা দেখা যাক। — আমি বলি, বোর্ডে লিখলাম।

হাত্ + টান = হাট্টান

পুরুত্ + ঠাকুর = পুরুট্ঠাকুর

এত্ + টুকু = এট্টুকু

সূত্রে লিখলে বলা যায়, ট-বর্গ পরে থাকলে ত-বর্গের জায়গায় ট-বর্গ হয়।

সূত্র ৮. ত-বর্গ + ট-বর্গ = ত-বর্গ > ট-বর্গ

আর অন্যোন্য সমীভবনের একটু উদাহরণ দেখা যাক। বোর্ডে গিয়ে লিখি,

উৎ + সন্ন = উচ্ছন্ন	কুৎ + সিত = কুচ্ছিৎ
বৎ + সর = বচ্ছর	উৎ + সব = উচ্ছব

এখানে দেখো, ত-বর্গের পরে 'স্' থাকলে দুয়ে মিলে 'চ্ছ্' হয়ে যাচ্ছে। সূত্র করে লিখলে বলা যায়,

সূত্র ৯. ত-বর্গ + স্ = চ্ছ্

আর একটাই সূত্র শেখা যাক। — আমি বলি। বোর্ডে গিয়ে লিখি—

কাত্ + হও = কাথও

রাগ্ + হয় = রাঘয়

সব্ + হয় = সভয়

ভাত্ + হয়েছে = ভাথয়েছে

লাজ্ + হীন = লাঝীন

সব্ + হারা = সভারা

এখানে দেখতেই পাচ্ছ স্পষ্ট মহাপ্রাণীভবন ঘটছে। পরে থাকা 'হ্'-এর কারণে আগের অল্পপ্রাণ

ধ্বনিগুলো সব মহাপ্রাণধ্বনির রূপ নিচ্ছে। তবে এইভাবে আমরা মুখেই কেবল বলি, কখনোই লিখি না।

সূত্র করে লেখা যায়, 'হ্' পরে থাকলে বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনির জায়গায় যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি হয়।

সূত্র ১০.

বর্গের প্রথম ধ্বনি + হ্ = বর্গের দ্বিতীয় ধ্বনি

বর্গের তৃতীয় ধ্বনি + হ্ = বর্গের চতুর্থ ধ্বনি

বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়মগুলোও প্রায় সবই আলোচনা করা হয়েছে। খুদে বৈয়াকরণদের মাথায় অজস্র প্রশ্ন কিলবিল করছে এখন। আমি ওদের ভাবার আর নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময় দিতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলাম। ওরা হয়তো

অনেকটাই বুঝেছে, তবু এত নিয়ম! বারবার প্রশ্ন তুলে বিষয়গুলো ওদের মাথায় গেঁথে দেওয়া প্রয়োজন। — আমি ভাবছিলাম।

টিফিনের সময় দেখি রাহুল, তৌফিক, ইয়াসমিনা, সন্ধ্যা, রাবেয়া, কৃশানু-সহ বেশ বড়ো একটা দল আমার খোঁজ করছে। আমি অবাক হয়ে ওদের কাছে যেতেই তৌফিক বলল, আমরা ঠিক করেছি আর কখনও ফার্স্ট বেঞ্চে বসা নিয়ে ঝগড়া করব না।

রাহুল বলল, রোজ নতুন নতুন জায়গায় বসব। ক্লাসটাকেও রোজ নতুন বলে মনে হবে তাহলে।

ইয়াসমিনা বলল, যারা ভালো করে অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না, তাদের পাশে গিয়ে বসব। না মিশলে জানব কী করে কেউ আমার ভালো বন্ধু হতে পারে কি না?

কৃশানু বলল, আপনি আমাদের শ্রেণিশিক্ষককে বলে দিলে আমরা কাল থেকেই শুরু করব। গোটা ক্লাস আলোচনা করে ঠিক করেছি।

আমি হেসে সম্মতি জানাতেই ওদের চোখমুখ ঝলমল করে উঠল।

ওদের ছুটে যাওয়া চেহারাগুলো দেখে বুঝতে পারলাম, সন্ধির নিয়ম ওরা কেমন শিখেছে, সেই প্রশ্নটা করার আর কোনো দরকার মনে হয় নেই।

হাতেকলমে

১.নীচের বাক্যগুলির থেকে ব্যঞ্জন সন্ধিবদ্ধ পদগুলি চিহ্নিত করো :

ক) সংশয় পারাবার অন্তরে হবে পার উদ্‌বেগে তাকায়ো না বাইরে।

খ) ধলেশ্বরী পাড়ি দিয়ে শান্তধারায় নৌকা আসে।

গ) ঘোমটায় ফাঁক রয় মন উন্মন্ গো।

ঘ) চাঁদ যে ঝিমায় আকাশকোণে সন্ধ্যাতারা স্বপন বোনে।

ঙ) বড়োরা কেউ যদি এই ভয়ানক বিপজ্জনক দৃশ্যটি দেখতেন তাহলে নিশ্চয় চিৎকার করে উঠতেন।

২. নীচের বাক্যগুলিতে যে পদগুলি ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়মে বদ্ধ সেগুলি চিহ্নিত করে সন্ধি বিচ্ছেদ করো :

ক) সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করত।

খ) সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ চুমি।

গ) উল্লাসে ভরে যায় চারদিক।

ঘ) আর শুরু হলো বাচ্চাগাছের অঝোরে কান্না।

ঙ) তারা ভাবে ধনাই মামু গোঁয়ার তাই গোঁয়ার্তুমি করেই মধু কাটে।

৩. নীচের পদগুলি ব্যঞ্জন সন্ধির কোন নিয়ম মেনে বদ্ধ হয়েছে, লেখো :

ক) উচ্চারণ, বট্‌ঠাকুর, উচ্ছ্বাস, সজ্জন, মৃদঙ্গ, আচ্ছাদন, বাগ্‌বিস্তার, ঘোড়াড্ডিম, সংলগ্ন, নিশ্চয়

শব্দ ও পদ

টিফিনের পর ক্লাসে ঢুকে সবাই দেখল বোর্ডে লেখা আছে :

কৃশানু আর তার বন্ধুরা ভালো খেলেছে।

বোর্ডে এ রকম একটা লেখা রয়েছে বলে যখন সবাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে, তখন আমি ঢুকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এটা কী?

সবাই বলল, বাক্য।

ঠিক। এই বাক্যের মধ্যে কী কী আছে?

শব্দ আছে। শব্দ দিয়েই তো বাক্য তৈরি হয়।

হ্যাঁ, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি হয় বটে, কিন্তু যে রকম খুশি শব্দ বসিয়ে গেলে তো আর বাক্য তৈরি

হবে না। শব্দ বসানোরও একটা কায়দা আছে। কিন্তু সে কথায় পড়ে আসব। আগে তোমরা বলো এখানে যে শব্দগুলো আছে, সেগুলো বাক্যের মধ্যে কী কাজ করছে?

মীনা বলল, কাজ তো করে শুধু ক্রিয়া। এখানে 'খেলেছে' শব্দটা হলো ক্রিয়া।

এটা ঠিক যে 'খেলেছে' শব্দটা ক্রিয়া। কিন্তু কাজ বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি যে বাক্যের মধ্যে প্রত্যেকটি শব্দের একটা ভূমিকা আছে। যেমন ধরো 'কৃশানু' বলতে তোমরা কী বোঝ?

সবাই বলল যে 'কৃশানু' হলো একটা ছেলের নাম।

বেশ। আর 'তার' শব্দটা কেন এসেছে?

রত্না বলল, ‘কৃশানুর বন্ধুরা’ বললেই হতো।

হ্যাঁ, কিন্তু শুনতে ভালো লাগত না। বারবার একই শব্দের ব্যবহার শুনতে ভালো লাগে না। তাই ‘কৃশানু’ নামটার বদলে ‘তার’ শব্দটা এসেছে। আর ‘বন্ধুরা’ হলো কৃশানুর মতোই আরো অনেকে। ‘ভালো’ বলতে কী বোঝানো হচ্ছে?

সবাই বলল, কৃশানুরা যে খেলাটা খেলেছে, সেটা ভালো হয়েছে বলেই ‘ভালো’ শব্দটা এসেছে।

একদম ঠিক বলেছ। আর মীনা তো বলেইছে যে ‘খেলেছে’ শব্দটা কাজ বোঝাচ্ছে। তাহলে পড়ে রইল ‘আর’ শব্দটা। সে কেন আছে?

কৃশানুর সঙ্গে তার বন্ধুরাও যে ভালো খেলেছে সেটা বোঝানোর জন্য।

বেশ। তাহলে তোমরা দেখছ যে বাক্যের মধ্যে সব কটা শব্দেরই কোনো-না-কোনো ভূমিকা

আছে। কোনো একটা শব্দকে সরিয়ে নিলে কিন্তু বাক্যটার কোনো মানে থাকে না। আর এই প্রত্যেকটা ভূমিকার একটা করে নাম আছে ব্যাকরণে। একে একে বলছি। সবাই বেশ চিন্তিত মুখেই আমাকে সমর্থন করল।

প্রথমে মীনার কথাতেই ফিরি। তোমরা আগের ক্লাসেই জেনেছ যে বাক্যের মধ্যে একটা অংশ থাকে যাকে ক্রিয়া বলে — যা দিয়ে সাধারণত কাজ বোঝায়। তার সঙ্গে এটাও তোমরা জানো যে বাক্যের মধ্যে কর্তা আর ক্রিয়া ছাড়াও অনেক সময় 'কর্ম'ও থাকে? যেমন,

আমি ভাত খাই।

— এই বাক্যে 'ভাত' হলো 'কর্ম'। ক্রিয়াকে 'কী' বা 'কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাই তা হলো কর্ম। যদি কোনো বাক্যের

মধ্যে ‘কর্ম’ থাকে, তাহলে সেই বাক্যের ক্রিয়াকে আমরা বলি সকর্মক ক্রিয়া। আর যদি এমন কোনো বাক্য পাই, যেখানে কর্ম নেই, তাহলে সেই বাক্যের ক্রিয়াকে আমরা বলি অকর্মক ক্রিয়া। যেমন,

কৃশানু আর তার বন্ধুরা ভালো খেলেছে।

— এই বাক্যে কোনো কর্ম নেই। তাই ‘খেলেছে’ অকর্মক ক্রিয়া। কিন্তু যদি বাক্যের মধ্যে ‘ফুটবল’ শব্দটা থাকত, অর্থাৎ বাক্যটা যদি হতো ‘কৃশানু আর তার বন্ধুরা ভালো ফুটবল খেলেছে’ — তাহলে ‘খেলেছে’ ক্রিয়াটি হতো সকর্মক ক্রিয়া। ব্যাপারটা বোর্ডে লিখি :

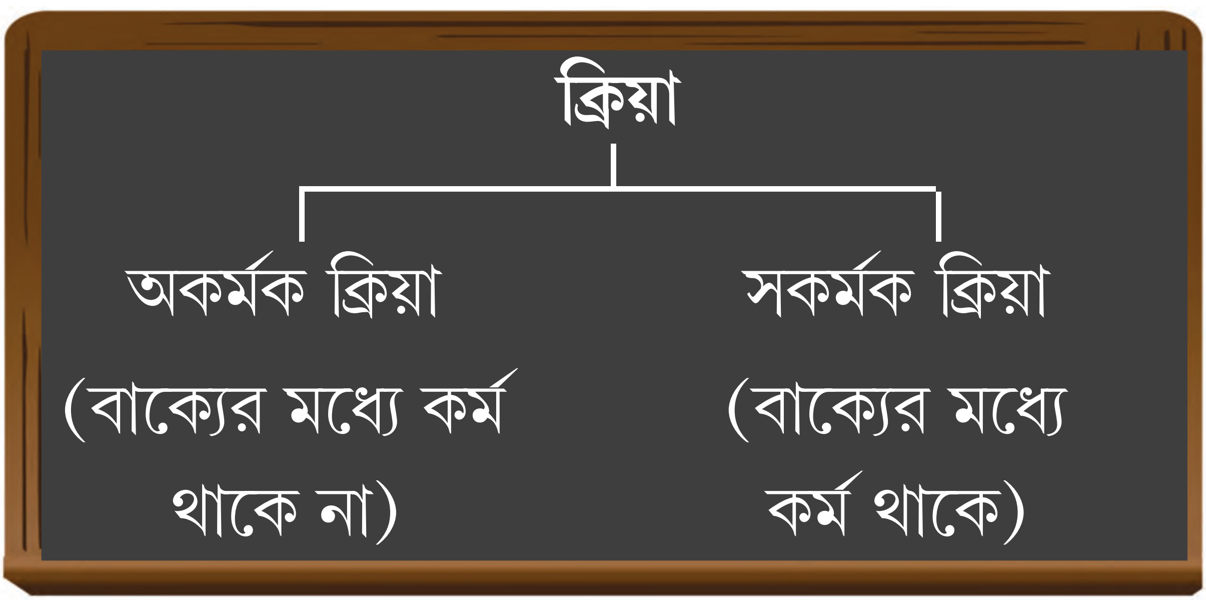

ক্রিয়াকে আবার আরেক ভাবেও দেখা যায়। যেমন যদি বলি,

কৃশানু বল নিয়ে

— তাহলে তোমাদের কী মনে হচ্ছে?

বিশ্বজিৎ বলল, মনে হচ্ছে বাক্যটা যেন শেষ হলো না। আরো কিছু বলার আছে।

কেন তোমার এ রকম মনে হলো? আগের বাক্যে তো এমন মনে হয়নি!

হ্যাঁ। 'মাঠে গেছে' বললে বোঝা যায় যে বাক্যটা শেষ হয়েছে। কিন্তু 'গেছে'র বদলে 'নিয়ে' হয়েছে বলে মনে হচ্ছে যেন আরো কিছু আছে, বাক্যটা শেষ হয়নি।

একদম ঠিক ধরেছ, বিশ্বজিৎ। ক্রিয়ার মধ্যে এমন অনেক ক্রিয়াবাচক শব্দ আছে যা দিয়ে বোঝা যায় যে বাক্যটা শেষ হয়েছে। যেমন 'খেলেছে'

শব্দটা। আবার অনেক ক্রিয়াবাচক শব্দ আছে যা দিয়ে বোঝা যায় যে বাক্যটা শেষ হয়নি, আরো একটু বাকি আছে। ‘শেষ হওয়া’র একটা ভালো বাংলা প্রতিশব্দ আছে — ‘সমাপিকা’। তাই যে ক্রিয়াবাচক শব্দের মাধ্যমে বোঝা যায় যে বাক্যটি শেষ হয়েছে, সেই বাক্যের ক্রিয়াকে বলে সমাপিকা ক্রিয়া। আর যদি বোঝা যায় যে বাক্যটি শেষ হয়নি, তাহলে সেই ক্রিয়ার নাম কী হবে?

সবাই বলল অসমাপিকা ক্রিয়া।

একদম ঠিক। এটাও বোর্ডে লিখে দিই :

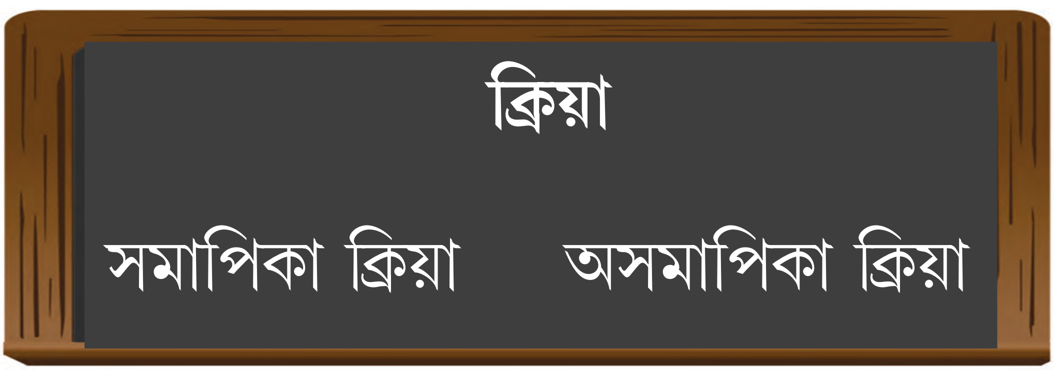

এবারে আসি নাম প্রসঙ্গে। বাক্যের মধ্যে নাম কোথায় আছে?

সবাই সমস্বরে বলল, 'কৃশানু'।

বেশ। ব্যাকরণের ভাষায় একে বলে বিশেষ্য। ব্যক্তির নাম বা বইয়ের নাম বা জায়গার নাম অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো নাম বোঝালে আমরা তাকে সংজ্ঞাবাচক

বিশেষ্য বলব। কিন্তু 'নাম' তো সব কিছুরই হয়। তেমন এই যে 'বন্ধু' শব্দটা। এই শব্দকে কি তোমরা 'নাম' বলবে?

সবার মুখ চাওয়াচাওয়ি দেখে মনে হলো আমার কথা ঠিক ওদের মনে ধরছে না।

আমি বললাম, দেখো এই যে তোমরা এখানে এতজন আছ, তোমরা কি একে অপরের মা, বাবা, ভাই, বোন, দাদা না দিদি?

এবার সবাই বলল, আমরা এ সব কিছুই নই। আমরা হলাম বন্ধু।

তার মানে তোমাদের মধ্যে একের সঙ্গে অপরের যে সম্পর্ক, তার নাম 'বন্ধু'। তেমনি মা, বাবা, ভাই, বোন, শিক্ষক, শিক্ষিকা সবই হলো বিভিন্ন বিষয়ের নাম। তাই এগুলোও বিশেষ্য। 'বন্ধু' যেমন, তেমনি 'বাহিনী', 'ফৌজ', 'দল', 'জনতা' এইরকম শব্দগুলো কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে না বুঝিয়ে এক গোষ্ঠী বা দলকে বোঝায়। এই ধরনের বিশেষ্যগুলো হলো সমষ্টিবাচক বিশেষ্য।

কৌশিক বলল, আমার একটা প্রশ্ন আছে, আপনি তো বললেন যে কোনোকিছুর 'নাম' হলো বিশেষ্য। কাজেরও তো নাম হয়, তাহলে তা ক্রিয়া হবে না বিশেষ্য?

খুব ভালো প্রশ্ন। কাজের যে নাম তা নিশ্চয়ই বিশেষ্য হবে। আর সেই বিশেষ্যের নাম হবে

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। যেমন ধরো, ‘ভ্রমণ হলো পড়াশুনোর অঙ্গ’। এখানে ‘ভ্রমণ’ তো একটা কাজের নাম। তাই এ বাক্যে ‘ভ্রমণ’ কে আমরা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলব। আর ক্রিয়া হলো ‘হলো’ শব্দটা। বেশ এ রকম দু-তিনটি বাক্য তাই লিখে দিচ্ছি :

তোমার রান্নার কোনো তুলনা নেই।

খেলা অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে।

গ্রহণ ও বর্জন করে একটা চূড়ান্ত লিস্ট বানাও।

এছাড়াও গুণবাচক বা ভাববাচক এবং শ্রেণিবাচক শব্দও কোনো-না-কোনো গুণ বা ভাব ও শ্রেণির নাম বোঝায়। তাই সেগুলোও বিশেষ্য।

তাহলে কী ‘কৃশানু আর তার বন্ধুরা ভালো খেলেছে’-এ বাক্যে ‘ভালো’ শব্দটাও বিশেষ্য?

তোমার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে আমি বোর্ডে আর একটা জিনিস দেখাই :

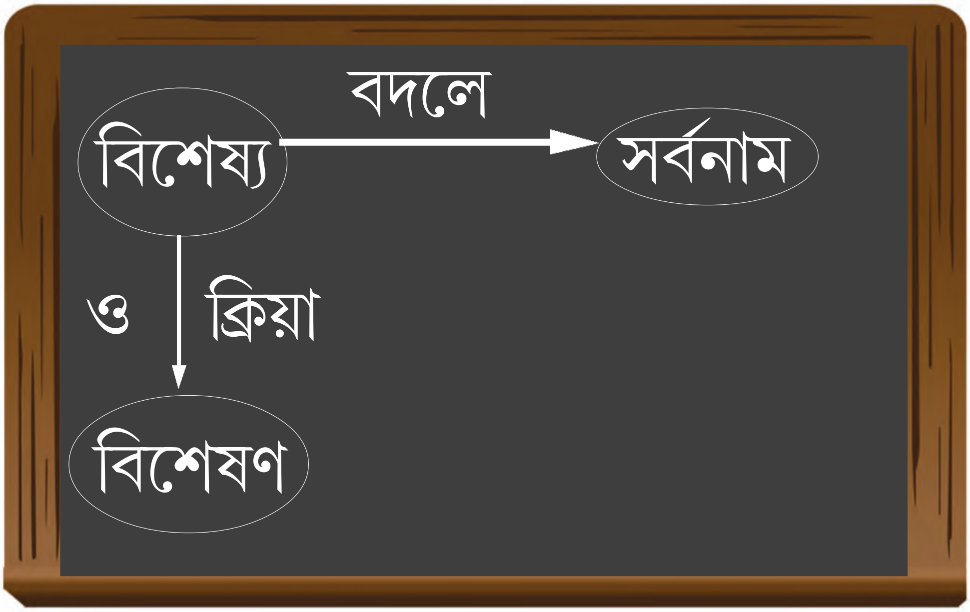

সবাই দেখল, কিন্তু মনে হলো যে ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হলো না ওদের।

আমি বললাম যে, বিশেষ্যের সঙ্গে সর্বনামের যেমন একটা সম্পর্ক আছে, তেমনি বিশেষ্য ও ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষণেরও একটা যোগ আছে। নীচের কথোপকথনটা খেয়াল করো :

তাপস : অনির্বাণের যে আজ আসার কথা ছিল, কী হলো ?

শুভাশিস : সে তো আজ মামার বাড়ি গেছে। আসবে না। তোমায় জানায়নি?

তাপস : না, আমায় জানায়নি। তুমি জানলে কী করে?

নীচে দাগ দেওয়া শব্দগুলো দেখো। ওখানে কি ‘নাম’ বসানো যায়?

সারা ক্লাস বলল, যায়।

কেমন হবে তা হলে? লিখে দেখাও।

তাপস : অনির্বাণের যে আজ আসার কথা ছিল, কী হলো?

শুভাশিস : অনির্বাণ তো আজ মামার বাড়ি গেছে। আসবে না। তোমায় জানায়নি?

তাপস : না, তাপসকে জানায়নি। শুভাশিস, জানলে কী করে?

বেশ। এইভাবে কী কথা বলি আমরা? না কী বারবার কারুর নাম ব্যবহার না করে 'সে', 'তুমি', 'আমি', 'তিনি' এসব ব্যবহার করি নামের বদলে?

সবাই বলল, হ্যাঁ, আমার আগের মতো করে বলি আর লিখি।

বেশ। তাহলে বিশেষ্যের বদলে আমরা যে শব্দগুলো ব্যবহার করলাম, তার একটা নাম আছে ব্যাকরণে। এদেরকে বলি সর্বনাম।

সে জন্যেই কি আপনি বোর্ডের ছবিতে 'বিশেষ্য' আর 'সর্বনাম'-এর মাঝে 'বদলে' শব্দটা লিখেছিলেন?

ঠিক তাই। ব্যক্তি ছাড়াও বস্তুর ক্ষেত্রেও এমনটা হয়। এটা/এটি, ওটা/ওটি, এগুলো, ওগুলো-এ সবই বস্তুর নামের পরিবর্তে বসে। তাই এগুলোও সর্বনাম।

আর ওই ছবিতে 'বিশেষণ' বলে যেটা লিখেছেন সেটা তাহলে কী?

বলছি। তার আগে এই বাক্যগুলো দেখো :

কৌশিক কৃশানুর ভালো বন্ধু। .... (১)

কৌশিক কৃশানুর খুব ভালো বন্ধু। .... (২)

কৃশানু ভালো খেলেছে। .... (৩)

সবাই দেখল। খুব সহজ তিনটি বাক্য। তাই এগুলো হঠাৎ ওদের কেন লক্ষ করতে বললাম, ওরা তো বুঝতে পারছে না।

আমি বললাম, ১নং বাক্যে 'বন্ধু' কেমন?

সবাই বলল, ভালো।

বেশ। 'ভালো' এটা কার সম্বন্ধে বলছে?

'বন্ধু' সম্পর্কে।

'বন্ধু' কী? বিশেষ্য তো?

হ্যাঁ। বন্ধু বিশেষ্য। এখানে বিশেষ্যটি কেমন তা বোঝাচ্ছে।

বাঃ। তাহলে ৩নং বাক্যটা দেখো। সেখানো ‘ভালো’ কোনটা।

কৃশানুর খেলা।

তাহলে ‘খেলেছে’ বিশেষ্য না ক্রিয়া?

ক্রিয়া। বুঝেছি, এখানে ক্রিয়াটি কেমন তা বোঝাচ্ছে।

বাঃ। দারুণ। তাহলে বিশেষ্য আর ক্রিয়ার গুণ, দোষ, অবস্থা, পরিমাণ ইত্যাদি যে শব্দ দিয়ে বোঝানো, তাকে বলে বিশেষণ। এবার নিশ্চয়ই বোর্ডে আঁকা ছবিটার মানেটা বুঝতে পারছ।

সবাই মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। কিন্তু দু-একজন বলল, আপনি তো ২নং বাক্যটা নিয়ে কিছু বললেন না?

আমি হেসে বললাম, বলিনি, কিন্তু এবার বলব। তোমরা নিজেরাই বলো তো বাক্যটায় কী ঘটেছে?

রাবেয়া বলল, এখানে একটা বিশেষণের আগে আরেকটা বিশেষণ আছে।

একদম ঠিক। এরকম তো আমরা হামেশাই বলি। 'খুব ভালো', 'কুচকুচে কালো', 'গাঢ় নীল' ইত্যাদি। এগুলোকে আমরা 'বিশেষণের বিশেষণ' বলতে পারি।

তাহলে কী বাকি দুটো 'বিশেষ্যের বিশেষণ' আর 'ক্রিয়ার বিশেষণ' হবে?

আমি অবাক হয়ে গেলাম এদের বুদ্ধি দেখে। বললাম, তোমরা ঠিক বলেছ। বিশেষণ সাধারণত তিন ধরনের হয় : নাম বিশেষণ (যেটাকে তোমরা বিশেষ্যের বিশেষণ বলেছ), ক্রিয়া বিশেষণ এবং বিশেষণের বিশেষণ।

তাহলে কৃশানু তার বন্ধুরা ভালো খেলেছে’—বাক্যের বিশেষণ কি ক্রিয়া বিশেষণ?

হ্যাঁ, তাই তো হবে। এবার বলো তো, ওই বাক্যে কে বাকি রয়ে গেল?

শুধু আর নিয়ে আপনি কিছু বলেননি?

এবার তোমরা বলো, আমি শুনব।

এটা নিয়ে বলার কী আছে! ‘আর’ দুটো আলাদা বাক্যকে জুড়ে দিয়েছে। এরকম আরো শব্দ আছে, যেমন এবং, ও।

বেশ! এবার আমি একটু বলি। বাক্যের মধ্যে অনেক সময়ে দেখবে এমন কিছু শব্দ থাকে, যেগুলোর কোনো পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু ধরো আর, অথচ, কিন্তু, বাঃ, দারুণ, ধুম, ইস্ এগুলো বাক্যের মধ্যে ঢুকে থাকে। ঠিক মিশে যায় না। এগুলোকে ‘অব্যয়’ বলে। পরে যখন তোমরা একটু বড়ো হবে, তখন এ নিয়ে আরো কথা বলব।

বেশ। এবার তাহলে দেখি ওই বাক্যটার মধ্যে শব্দগুলো কীভাবে রয়েছে।

কৃশানু আর তার বন্ধুরা ভালো খেলেছে।

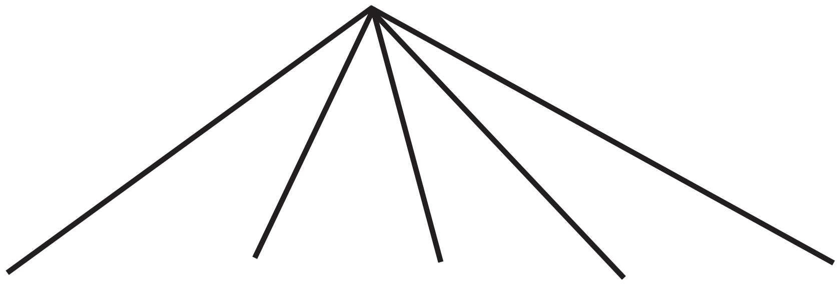

বিশেষ্য	বিশেষণ	সর্বনাম	অব্যয়	ক্রিয়া
কৃশানু, বন্ধুরা	ভালো	তার	আর	খেলেছে

বাংলায় তাহলে কী পাঁচ রকম শব্দ আছে? রাবেয়ার এই প্রশ্নে আমি একটু থমকে গেলাম। দাঁড়াও আমি একটা জিনিস দেখাই :

শীত শেষ সুন্দরবন গাছ ফুল ধর। —— (১)

শীতের	শেষে	সুন্দরবনের
(শীত + এর)	(শেষ + এ)	(সুন্দরবন + এর)

গাছে ফুল ধরবে। —— (২)
(গাছ + এ) (ফুল + অ) (ধর + বে)

এবার তোমরা বলো ১নং কে কি তোমরা বাক্য বলবে?

না, বলব না। কারণ শব্দগুলোর অর্থ থাকলেও সব মিলিয়ে মানে দাঁড়াচ্ছে না।

কেন? সব শব্দই তো আছে। তাহলে মানে দাঁড়াচ্ছে না কেন?

সবাই নানা রকম বলার চেষ্টা করল।

বেশ। আমি বলছি। ২ নং বাক্যটাতে শব্দের সঙ্গে এমন কিছু টুকরো যোগ করা হয়েছে, তাতেই মানেটা ফুটে উঠেছে, তাই না? তাহলে দেখো

শব্দ সাজালেই বাক্য হয় না, শব্দকে তৈরি করে নিতে হয়। যখন শব্দ বাক্যে ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়, এখন সেগুলিকে শব্দ না বলে আমরা বলব ‘পদ’। আর সেই পদ হলো পাঁচ রকম : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া।

হাতেকলমে

১.নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোনটি কোন পদ চিহ্নিত করো :

১.১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলি লিখেছেন।

১.২ তিনি আমাকে তাঁর গল্পের বইগুলি দিলেন।

১.৩ আমি চিঠিটা লিখে বাড়ি যাব।

১.৪ ঘুম ভেঙেছে?

১.৫ তুমি তো বললে কথাটা।

২.নীচের বাক্যগুলির মধ্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলি কোন শ্রেণির লেখো :

২.১ স্বাতীদিদি আমাদের ব্যাকরণ পড়ান।

২.২ ফুল দেখে মনটা আনন্দে ভরে উঠল।

২.৩ দার্জিলিং থেকে রাবেয়া মীনাকে চিঠি লিখেছে।

২.৪ সৌম্য ঝড়ের মতো এল, ঝড়ের মতো চলে গেল।

৩.নীচের শূন্যস্থানগুলি নির্দেশ অনুযায়ী পূরণ করো :

৩.১ __________! কেমন আছিস?

(অব্যয়)

৩.২ __________ চলে আয়।

(ক্রিয়াবিশেষণ)

৩.৩ সঞ্জয় আর ______ ______ মিলে কাজটা করেছে।

(সর্বনাম) (বিশেষ্য)

৩.৪ আমি ______ বললাম ______ কী হবে কে জানে!

(অব্যয়) (অব্যয়)

৩.৫ ______ শোনে না।

(অসমাপিকা ক্রিয়া)

লিঙ্গ

ক্লাসে ঢুকতেই শুনি জোর আলোচনা চলছে কোনো একটা বিষয় নিয়ে। আমার উপস্থিতি টেরই পায়নি কেউ। ওদের কথা শুনে মনে হলো আগের পিরিয়ডে ইংরেজি ক্লাসে কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে। বললাম, কোনো অসুবিধে হচ্ছে নাকি তোমাদের?

এইবার সবাই আমাকে দেখে হই হই করে উঠল। ইংরেজিতে 'সে' বোঝাতে দু-রকম ব্যবহার হয়, He আর She. আর এর পরে কোনো ক্রিয়া বসলে তার সঙ্গে 's' বা 'es' যোগ হয়। যেমন, He walks বা She sings. বাংলায় তো এরকম হয় না। এই ছিল ওদের আলোচনার বিষয়।

আমি বললাম, এই ব্যাপারটা বুঝতে গেলে তোমাদের লিঙ্গ, পুরুষ এবং বচন সম্বন্ধে আগে জানতে হবে।

সবাই বলল, বেশ আপনি বলুন, আমরা শুনি। আমি বললাম, না। আমরা সবাই বলব আর শুনব। তবে শুরুটা আমি করছি।

প্রথমে আসি লিঙ্গের কথায়। তোমরা দেখো কৃশানু, কৌশিক, সৌরভ এদের একসঙ্গে 'ছেলে' বলি। আবার রাবেয়া, রত্না, সন্ধ্যা, নুসরত এরা হলো 'মেয়ে'। এবার যদি কৃশানু-কৌশিকদের বলি 'ছাত্র', তাহলে রাবেয়া-রত্নাদের কী বলব?

সবাই বলল, ছাত্রী। চমৎকার। তাহলে বুঝতে পারছ 'ছেলে' বা 'পুরুষ' এবং 'মেয়ে' বা 'স্ত্রী'-র

দিক থেকে কিছু কিছু শব্দ বদলে যায়। যদি বলি ‘শিক্ষক’, ‘বুদ্ধিমান’, ‘বালক’, ‘খোকা’, ‘জ্যেষ্ঠ’ তাহলে এই শব্দগুলি ‘পুরুষ’ বোঝাচ্ছে না ‘স্ত্রী’ বোঝাচ্ছে?

আবার সবাই বলল, পুরুষ।

কী করে বুঝলে যে এই শব্দগুলো দিয়ে ‘পুরুষ’ বোঝানো হচ্ছে?

আচ্ছা বলোতো ‘খুকি’, ‘বালিকা’, ‘শিক্ষিকা’, ‘বুদ্ধিমতী’, ‘জ্যেষ্ঠা’ এই শব্দগুলো কী বোঝাচ্ছে?

মেয়ে বা স্ত্রী বোঝাচ্ছে।

কিন্তু তোমরা বুঝছ কী করে?

রত্না বলল, শব্দগুলো শুনেই তো বুঝতে পারছি। যেমন ‘শিক্ষক’ পুরুষ আর ‘শিক্ষিকা’ স্ত্রী।

দুষ্টুমি ভরা মুখে কৌশিক বলল, যেমন ‘রত্না’ শুনেই বোঝা যায়, এটা কোনো মেয়ের নাম।

আমি বললাম, কৌশিক আমাকে একটা দারুণ সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে। আমি 'নাম' দিয়েই শুরু করি। কৌশিক বলল 'রত্না' শুনলেই বোঝা যায় যে এটা মেয়ের নাম।

বেশ। বলোতো 'রমা' ছেলের নাম না মেয়ের নাম?

সবাই বলল, মেয়ের নাম।

আর যদি বলি 'রমাপদ' তাহলে কী হয়?

একটু হকচকিয়ে গিয়ে বলল, ছেলের নাম।

কী করে হলো এমনটা? আসলে শব্দের মধ্যেই এমন একটা চিহ্ন থাকে, তা দিয়ে এই ফারাকটা বোঝা যায়। এটা যে শুধু মানুষের ক্ষেত্রে হয়, তা নয় অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও হয়। এই ধরনের

চিহ্নকে আমরা ব্যাকরণে লিঙ্গ বলি। তবে লিঙ্গ কিন্তু চাররকমের—

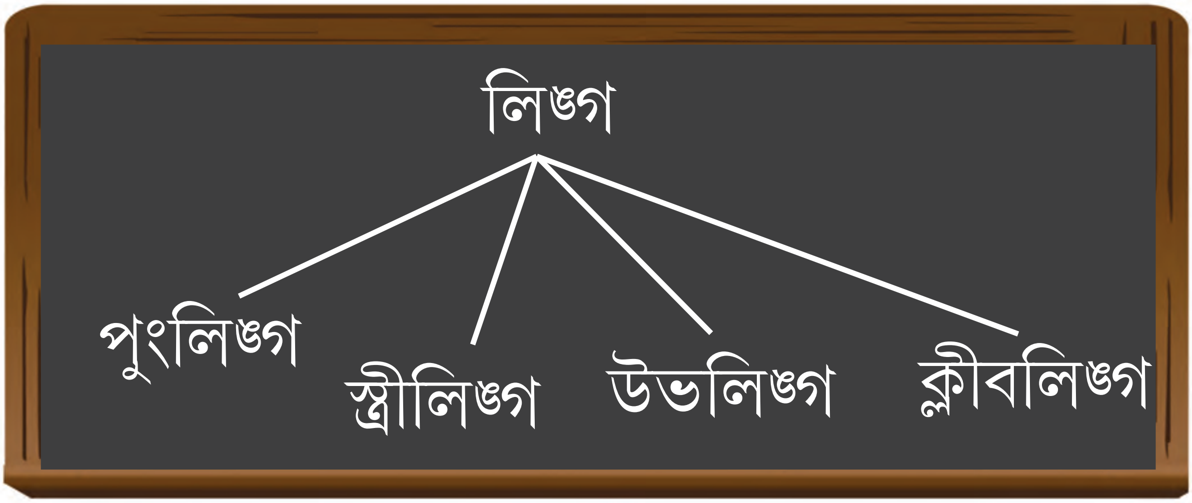

এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলি দিয়ে পুরষ বা স্ত্রী দুটোই বোঝায়, সেগুলিকে বলে উভলিঙ্গ। এরকম কোনো শব্দের কথা কি তোমরা বলতে পারো?

কিছুক্ষণ নিজেরা ভেবে নিল। তারপর সন্দীপ বলল, 'শিশু'। সন্দীপের শুনে সুমিতা বলল 'সন্তান'।

ঠিক। এরকম আরো হয়, যেমন—লোকজন, জনগণ, মানুষ ইত্যাদি। আবার এমন কিছু শব্দ

আছে যা দিয়ে পুরুষ বা স্ত্রী কিছুই বোঝায় না, সেগুলি হলো ক্লীবলিঙ্গ। যেমন— ঘর, বাড়ি, টেবিল, চেয়ার, কালি, কলম, জামাকাপড় ইত্যাদি।

এবার তোমাদের দেখাব কী করে পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গ করা যায়। সাধারণত পুংলিঙ্গবাচক শব্দের সঙ্গে আ, ঈ (ই), আনী/আনি, ইনী/ইনি ইত্যাদি যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ পাওয়া যায়।

প্রথমে আ যোগ করে কয়েকটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের উদাহরণ দিই :

সদস্য + আ = সদস্যা

শিষ্য + আ = শিষ্যা

প্রথম + আ = প্রথমা

নবীন + আ = নবীনা

সুমন + আ = সুমনা

চন্দন + আ = চন্দনা

শোভন + আ = শোভনা

এবার ঈ/ই যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ তৈরির উদাহরণ :

ছাত্র + ঈ = ছাত্রী

তাপস + ঈ = তাপসী

তরুণ + ঈ = তরুণী

মামা + ই = মামি

চাচা + ই = চাচি

সুন্দর + ঈ = সুন্দরী

এবার আনি বা আনী, নি বা নী যোগে :

ভব + আনী = ভবানী

শিব + আনী = শিবানী

শর্ব + আনী = শর্বাণী

ধোপা + নি = ধোপানি

ঠাকুর + আনি = ঠাকুরানি

গয়লা + নি = গয়লানি

পুংলিঙ্গের শেষে ইনি যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গের উদাহরণ :

অভাগা + ইনি = অভাগিনি

বাঘ + ইনি = বাঘিনি

সাপ + ইনি = সাপিনি

যেসব পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে অক আছে, সেগুলির সঙ্গে ইকা যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ করা হয় :

অধ্যাপক — অধ্যাপিকা   গায়ক — গায়িকা

নায়ক — নায়িকা   বালক — বালিকা

পাঠক — পাঠিকা   প্রকাশক— প্রকাশিকা

আবার এমন কিছু শব্দ আছে যার স্ত্রীলিঙ্গের রূপটাই অন্যরকম হয় বা শব্দটা বদলে যায়, যেমন :

ছেলে — মেয়ে

দাদা — দিদি

বর — কনে

কর্তা —গিন্নি

পুত্র — কন্যা

ভূত — পেতনি

মা — বাবা

বর বউ

সাহেব মেম

এছাড়া কিছু উভলিঙ্গবাচক শব্দ আছে যাদের আগে বা পরে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ তৈরি করা হয় :

কবি — মহিলা কবি   বেনে — বেনে বউ

কোনো শব্দের মধ্যে পুরুষবাচক চিহ্নের পরিবর্তে স্ত্রীবাচক চিহ্ন যোগ করে লিঙ্গ পরিবর্তন করা হয় :

বোনপো — বোনঝি

বেটা ছেলে — মেয়ে ছেলে

ভদ্রলোক — ভদ্রমহিলা

এছাড়াও পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে যদি বান বা মান থাকে তাহলে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দে তা বতী ও মতী হয়ে যায়।

বুদ্ধিমান — বুদ্ধিমতী

গুণবান — গুণবতী

হাতেকলমে

১. নীচের বাক্যগুলিতে পুংলিঙগবাচক শব্দগুলিকে বদলে বাক্যগুলি পুনরায় লেখো :

১.১. রমেশের দাদা কলেজের অধ্যাপক।

১.২. বৃদ্ধের আগমনে শিক্ষকমহাশয় উঠে দাঁড়ালেন।

১.৩. রবীন্দ্র সংগীতের গায়ক হিসেবে ভদ্রলোকের সুনাম আছে।

১.৪. সুমনের দাদু একটি পত্রিকার প্রকাশক।

২. নীচের বাক্যগুলিতে স্ত্রীলিঙগবাচক শব্দগুলিকে বদলে বাক্যগুলি পুনরায় লেখো :

২.১. ভাগ্নি-বোনঝিদের সঙ্গে নিয়ে মাসি বেড়াতে যাচ্ছেন।

২.২. গিন্নি-মায়ের আদেশে সকলে একসঙ্গে চলল।

২.৩. পাঠিকাদের সমাগমে লেখিকা একে একে সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

৩. লিঙ্গ পরিবর্তন করো :

৩.১ পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গ :

গুরু, তরুণ, কবি, সাহেব, বিদ্বান, অন্যতম, অনন্য, পুত্র, জেঠু, সন্ন্যাসী

৩.২ স্ত্রীলিঙ্গ থেকে পুংলিঙ্গ :

মেয়ে, ঠাকুমা, মহারানি, জ্যেষ্ঠা, কনিষ্ঠা, নায়িকা, পূজনীয়া, বাঘিনি, সুস্মিতা, বাঁদর

বচন

ক্লাসে ঢুকে দেখি কয়েকজন জটলা করে কিছু একটা করছে। কৃশানু অন্যদিকে বেঞ্চে একা বসে বই পড়ছে। আমি ঢুকেই জটলার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম, ‘তোমরা কী করছ?’

ওরা বলল,‘আমরা শব্দজব্দ খেলছিলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কৃশানু কী করছ?’

কৃশানু বলল, ‘আমি গল্পের বই পড়ছিলাম।’

আমি বললাম, দেখো তোমাদের কথার মধ্যে আর আমার কথার মধ্যে একটা জিনিস ঘটে গেছে। বোর্ডে আমি লিখছি কথাগুলো :

তোমরা কী করছ?

আমরা শব্দজব্দ খেলছিলাম।

আমি গল্পের বই পড়ছিলাম।

খেয়াল করো, উপরের রঙিন শব্দগুলো। বলো তো এখানে কী ঘটেছে?

রত্না বলল, এ তো খুব সহজ। এই তিনটিই সর্বনাম।

হ্যাঁ, ঠিক। কিন্তু সর্বনাম ছাড়াও এখানে আরও একটা কিছু ঘটেছে, কী সেটা?

সবাই নানা কিছু ভাবল। তারপর উত্তরটা এল রাবেয়ার কাছ থেকে। রাবেয়া বলল, 'তোমরা' আর 'আমরা' শব্দদুটোতে অনেককে বোঝানো হচ্ছে, কিন্তু 'আমি' বলতে এখানে কৃশানু একা।

রাবেয়া একদম ঠিক বলেছে। 'তোমরা' আর 'আমরা' বলেছি একের বেশি বোঝাতে আর 'আমি' বলা হয়েছে একজন বোঝাতে। বাংলায় অনেকভাবে এই বিষয়টি বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন ধরো 'লোকটি' বললে একজনকে বোঝায়

আর লোকগুলি বললে একের বেশি বোঝায়। তাই না?

সবার ভাব-গতিক দেখে মনে হলো যে এটা খুবই একটা সাধারণ ব্যাপার। আলাদা করে বলার কী আছে।

আমি তখন বললাম, কথা বলার সময়ে এইভাবে কোনো প্রাণী বা বস্তুর সংখ্যা বা পরিমাণ সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা দিই, তাকে ব্যাকরণের ভাষায় 'বচন' বলে। যদি কোনো একটি প্রাণী বা বস্তু বোঝায় তাকে একবচন আর একের বেশি বোঝালে বহুবচন বলি। সংস্কৃত ভাষায় 'দুটি' বোঝাতে দ্বিবচন ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাংলায় ইংরেজির মতোই বচন বা Number দু'-ধরনের: একবচন (Singular) এবং বহুবচন (Plural)।

ব্যাপারটা বোর্ডে লিখেছিলাম :

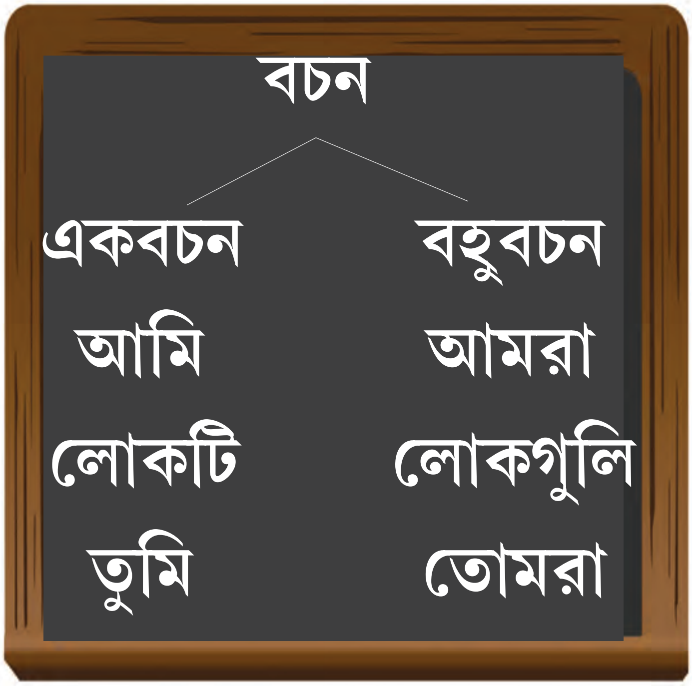

আমি

আমরা

এখানে দেখো একবচন বোঝাতে ‘লোক’-এরপর ‘টি’ যোগ করা হলো। আর বহুবচন বোঝাতে ‘গুলি’ যোগ করা হলো। এবার তোমরা বলো তো আর কী কী ভাবে একবচন বোঝানো যায়।

সবাই তখন নানারকম বলতে লাগল। ওদের বলা কথাগুলোকে এখানে ছকের আকারে সাজিয়ে দিচ্ছি :

- প্রাণী বা বস্তু উভয়ক্ষেত্রেই টি, টা যোগ করে

ফুল + টি = ফুলটি

মানুষ + টা = মানুষটা

মেয়ে + টি = মেয়েটি

পথ + টা = পথটা

- শুধু বস্তুর সঙ্গে খানা, খানি যোগ করে

বাড়ি + খানা = বাড়িখানা

বই + খানি = বইখানি

মালা + খানি = মালাখানি

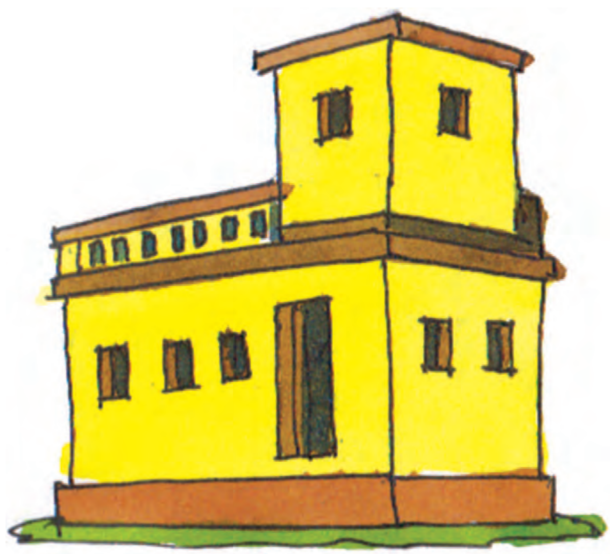

মীনা নিজের মনে কী সব যেন বলছিল। আমি একটু সাহস দিলাম, ‘তুমি কি কিছু বলবে?’

মীনা বলল, আমরা তো একটা বই বোঝাতে ‘টি’ বা ‘খানা’ না যোগ করে ‘এক’ শব্দ দিয়েও তো বলি। যেমন, এক দেশে এক রাজা ছিল। বা, একটা কাগজ তোমাকে দেওয়ার ছিল।

ক্লাসের সবাই ওর কথা বুঝতে পেরে দারুণভাবে সমর্থন করল।

বেশ। একবচন ব্যাপারটা তোমরা বেশ রপ্ত করেছ। এবার বহুবচনের পালা। আমি এবার কিছু বলব না। তোমরা এসে বোর্ডে বহুবচন কত রকম হয় দেখাও।

একে একে এসে বেশ কয়েকটি নিয়ম তারা লিখল :

● প্রাণী বা বস্তুর সঙ্গে গুলো, গুলি যোগ করে

গাছ + গুলো = গাছগুলো

লজেন্স + গুলি = লজেন্সগুলি

বিড়াল + গুলো = বিড়ালগুলো

● প্রাণীর সঙ্গে রা যোগ করে

ছেলে + রা = ছেলেরা

মেয়ে + রা = মেয়েরা

পাখি + রা = পাখিরা

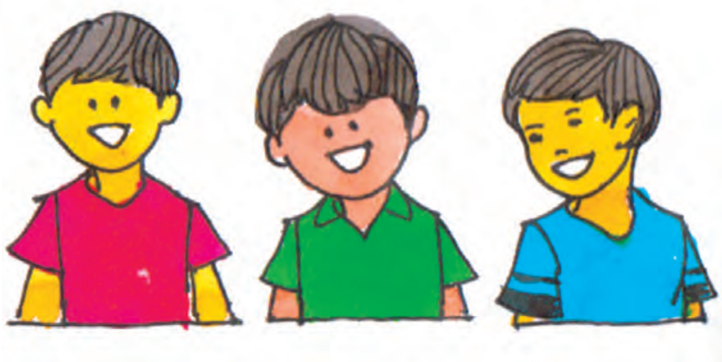

- প্রাণীর সঙ্গে দের, দিগের যোগ করে

ছেলেমেয়ে + দের = ছেলেমেয়েদের

মনুষ্য + দিগের = মনুষ্যদিগের

- অনেক, সব যোগ করে

অনেক মানুষ

সব সদস্য

খুব ভালো। কিন্তু আরও কিছু শব্দ আছে যেগুলো যোগ করলে বহুবচন বা সমষ্টি বোঝায়। যেমন— গণ, গুচ্ছ, পাল, মহল, রাশি, সমূহ, বৃন্দ ইত্যাদি। বাক্যের মধ্যে দেখো কীভাবে এগুলোর ব্যবহার করা হয় :

বন্ধুগণ তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? এই ঘটনায় বুদ্ধিজীবীমহলে সাড়া পড়ে গেছে। মেঘরাশি ভেসে যাচ্ছে নীল আকাশে। সিদ্ধান্তসমূহ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভক্তবৃন্দের ভিড়ে মন্দিরচত্বর পরিপূর্ণ।

আবার দেখো কীভাবে একই শব্দকে দু-বার ব্যবহার করেও বহুবচন করা যায়—

দেশে দেশে : দেশে দেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল।

গাছে গাছে : গাছে গাছে এখন ফুল ফুটে আছে।

কচি কচি : সমস্ত মাঠটা কচি কচি ঘাসে ভরে গেছে।

কেউ কেউ: কেউ কেউ নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত নও!

এইভাবে বহুবচন করার খেলায় সারা ক্লাস মেতে উঠল। শুধু কৃশানু হাত তুলে জানাল যে ও

কিছু বলতে চায়। আমি অনুমতি দিতেই সে চিন্তিত মুখে উঠে দাঁড়াল। বলল, অনেক সময়ে তো কোনো কিছু যোগ না করলেও বহুবচন বোঝায়, একবচন বোঝায় না।

ক্লাসের অনেকেই খুব আপত্তি জানাল। বলল, এরকম হয় নাকি কখনও ! আমি বললাম, উদাহরণ দিয়ে তোমার কথাটা বোঝাও।

যেমন ধরুন, 'মানুষ মরণশীল' বললে একজন মানুষ তো মরণশীল বোঝায় না, সব মানুষকেই বোঝায়।

আমি বললাম, 'পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে' বললে তো একটা পাখিকে বোঝায় না, অনেক পাখিকে বোঝায়। এটাই তো বলতে চাইছ, কৃশানু ?

কৃশানু মাথা নেড়ে সায় দিল।

তোমরা কি এবার মানবে যে কৃশানু ঠিক বলেছে ?

সারা ক্লাসে এবার হই হই করে কৃশানুর পাশে দাঁড়াল।

আমি বললাম, ক্লাস শেষ হয়ে এসেছে। আমি একটা বাক্য লিখব। তোমাদের বলতে হবে, কী ভুল আছে সেই বাক্যের।

এইসব কথাগুলো না বললেই ভালো হয়।

দেখি সব চুপ করে আছে। আমি আবার লিখলাম,

এইসব কথা না বললেই ভালো হয়।

দেখো তো ‘কথা’ এখানে কোন বচন?

সবাই বলল, বহুবচন।

বেশ। এবার দেখো,

এই কথাগুলো না বললেই ভালো হয়।

এবার?

এবারও বহুবচন।

তাহলে,

এইসব কথাগুলো না বললেই ভালো হয়।

বললে কী হয়?

দু-বার বহুবচন হয়। দু-বার বহুবচন হলে কি সেটা দোষের?

একবারেই যখন বহুবচন বোঝানো যাচ্ছে, তখন দু-বার করে কী হবে? কোনো কিছুই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভালো নয়। তাই না?

হাতেকলমে

১.নীচের অনুচ্ছেদগুলিকে নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দগুলিতে কোন কোন বচনের ব্যবহার হয়েছে, তা নির্ণয় করো :

১.১ আজ থেকে ঠিক বাহান্ন বছর আগে মা-বাবা-ভাই-বোন আত্মীয়-বন্ধু ও ঘর-বাড়ি ছেড়ে আরামহীন অনিশ্চিতের পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম অজানাকে জানার ও অচেনাকে চেনার জন্য। সারা পৃথিবী ঘোরবার স্বপ্ন যা ছেলেবেলায় ভূগোল পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নেশার মতো আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল, ১৯২৬ সালের ১২ ডিসেম্বর, তার বাস্তব রূপ নেওয়ার পথের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হলো। আমার বয়স তখন তেইশ, সঙ্গে তিন বন্ধু — অশোক

মুখার্জি, আনন্দ মুখার্জি ও মণীন্দ্র ঘোষ। অশোক মুখার্জি আমাদের দলের নেতা। সাইকেল চারখানা আমাদের বাহন।

১.২ যাত্রা শুরু হলো সেই নির্দিষ্ট দেশের দিকে। কিছু দূরে যেতে না যেতে নানা প্রকারের বাধা আসতে লাগল। ক্রমশ তাঁরা এগোতে লাগলেন। যেখান দিয়ে যান সেখানে এক এক জায়গায় তাঁবু ফেলে খাবার রেখে যান এবং প্রত্যেক তাঁবুর উপর একটা করে পতাকা গুঁজে রাখেন, কারণ ফেরবার সময় যখন খাবার দরকার হবে তখন এই সমস্ত তাঁবু থেকেই তা পাওয়া যাবে এবং ফেরবার পথেরও নিশানা হবে।

১.৩ বেশ হই হই করে পথ চলছিলাম। অপরাহ্নে হঠাৎ মেঘ উঠল যেন নীল ঘাস দিয়ে বোনা পাখির বাসা। বাতাস আর বিদ্যুৎ তার

মধ্যে এসে ঘোঁট পাকাতে লাগল। তারপর পুটপাট করে বৃষ্টি নামল। আমাদের পাঁচজনের তাপ্পিমারা একটামাত্র ছাতা, সেটাও হাওয়ার দমকে উলটে গেল। বৃষ্টি ঝেঁপে এলে পথের পাশে গাছতলায় দাঁড়াই, কমে গেলে আবার হাঁটি—এইভাবে থেমে থেমে চলতে চলতে শেষে বিরক্ত হয়ে বেপরোয়া বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে লাগলাম। মাঠে মাঠে জল দাঁড়িয়ে গেছে। ছোটো ছোটো স্রোত এসে পড়ছে খালে, দূরে দেখা যায় পাটক্ষেতের উপর বৃষ্টি ঘুরপাক খাচ্ছে, জলের ছায়া কত দূর পর্যন্ত আমাদের ঘিরে আছে।

২. নীচের শব্দগুলির বহুবচনের রূপগুলি লেখো :

আমি, জন্তু, সে, টেলিভিশন, আমার, তিনি, পাঠশালা

৩.নীচের একবচন ও বহুবচন শব্দগুলি নির্দিষ্টস্থানে বসাও :

নৌ-সেনা, মা, তোদের, তাঁকে, মাঠ, তিমি, ধুলো, বন্ধুরা

একবচন	বহুবচন

৪.নীচের বাক্যগুলিতে কী ভুল আছে তা নির্দেশ করে বাক্যগুলি শুদ্ধ করে লেখো :

৪.১ একটি ছোট্ট ছোট্ট বইয়ের দোকান।

৪.২ যতীনদের রাগ তখন কমে এসেছে, তার মনের ভয় হয়েছে।

৪.৩ সুয্যিরা ডুবে গেছে কতক্ষণ!

৫.নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৫.১ বচন বলতে কী বোঝো। বাংলায় বচন কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুটি করে উদাহরণ দাও।

৫.২ বাংলায় একবচনকে বহুবচনে পরিণত করার তিনটি নিয়ম দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৫.৩ কোন কোন ক্ষেত্রে বহুবচন হয় না, উদাহরণসহ উল্লেখ করো।

৬.উদাহরণ দাও :

৬.১ সমার্থক শব্দযোগে বহুবচন।

৬.২ সর্বনামের দ্বিত্ব প্রয়োগে বহুবচন।

৬.৩ একবচনের রূপ দ্বারা বহুবচনের অর্থ।

৬.৪ বহুবচনের রূপ দ্বারা একবচনের অর্থ।

৬.৫ সমষ্টিবাচক শব্দের যোগে বহুবচন।

পুরুষ বা পক্ষ

ক্লাসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দেখি সবাই একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। কেউ বলছে ‘ওরা আমায় ঠেলেছে’, কেউ বলছে ‘আমি কিছু করিনি’, কেউ বা বলছে ‘তুই ইচ্ছে করে এ সব বলছিস। আপনি আমার কথা শুনুন’ — এই সব। সবার এত অভিযোগ যে কার কথায় কান দেব। তাই আমি বোর্ডে ওদের কথাগুলো লিখে দিলাম। এর ফলে একটু শান্ত হলো ক্লাস।

বললাম এই বাক্যগুলির মধ্যে ওরা, আমরা, আমি, তুই, আপনি — এই শব্দগুলো খেয়াল করেছ?

সারা ক্লাস ঝগড়া ভুলে এক হয়ে বলল, হ্যাঁ। এগুলো তো সর্বনাম।

ঠিক বলেছ তোমরা! কিন্তু সর্বনাম হলেও এই শব্দগুলোর মধ্যে একটা বিশেষ ব্যাপার আছে। দেখি তোমরা সেটা ধরতে পারো কি না।

একটু আগেই যে নালিশ করছিল যার বিরুদ্ধে, এখন দেখি তার সঙ্গেই গভীর আলোচনায় মেতে রয়েছে। তবে কিছুক্ষণ ভাবনাচিন্তা করার পরও তারা ধরতে পারল না সেই বিশেষ ব্যাপারটা।

আমি একটু তোমাদের ভাবতে সাহায্য করছি। তোমরা আগে তিনটি শব্দ নিয়ে ভাবো : আমি, তুই, ওরা।

একদল বলল, আমি আর তুই একবচন আর ওরা হলো বহুবচন।

একদিক থেকে দেখলে তোমাদের উত্তরটা ঠিক। কিন্তু সংখ্যা নয় মনের দিক থেকে ভাবো।

রত্না বলল 'আমি' শব্দটা নিজের বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। আর 'তুই' বলতে যার সঙ্গে কথা বলছি। 'ওরা' হলো যাদের সম্পর্কে বলছি।

দারুণ বলেছ। তাহলে তোমার কথা থেকে আমি একটা চার্ট বানাই :

নিজে বোঝাতে	যার সঙ্গে কথা হচ্ছে তাকে/ তাদের বোঝাতে	যার/যাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে তাকে/ তাদের বোঝাতে
আমি	তুই	ওরা

এই ব্যাপারটা রত্না বলতে চেয়েছে। তাই তো? এবার এই চার্টে বাকি শব্দগুলো তোমরা বসাও। এরকম আরো শব্দও তোমরা বসাতে পারো। শেষপর্যন্ত চার্টটা যে চেহারা পেল তা হলো এইরকম :

আমি পক্ষ / উত্তম পুরুষ (First Person)	তুমি পক্ষ / মধ্যম পুরুষ (Second Person)	সে পক্ষ / প্রথম পুরুষ (Third Person)
আমি আমায় আমাদের আমরা	তুই আপনি তোরা তোমরা আপনারা তোমায় আপনাকে	ওরা সে তিনি তাঁরা তারা তাদের ওর

এছাড়া আরো দুটি জিনিস এখানে আছে যে-দুটো তোমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। আমি বলে দেবো না কি তোমরা আবার ভাববে?

সবাই বলল, আমরা ভাবব।

বেশ।

কিছুক্ষণ ভাবার পর রাবেয়া বলল, আপনি বা তিনি এ ধরনের শব্দ কিন্তু উত্তম পুরুষ বা আমি-পক্ষে নেই।

দারুণ! দারুণ! এর কারণ হলো নিজেকে সম্মানিত বলে দেখানোর চল আমাদের ভাষায় নেই। কিন্তু অন্য দুটো ক্ষেত্রে সেটা দেখানো যায়। সাধারণত গুরুজন, অপরিচিত মানুষ এবং সম্মাননীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্প্রমার্থে এই ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়।

খেয়াল করো, ইংরেজি ভাষায় কিন্তু এই ব্যাপারটা নেই।

সারা ক্লাস আবার ভাবতে বসল। কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে পারছে না দেখে আমি বললাম, একটু ক্রিয়ার কথা ভাবো।

এই ইঙ্গিতটুকু পেতেই ধরে ফেলল ব্যাপারটা। সবাই দেখি বলতে চাইছে। আমি বললাম, ইয়াসমিন বলুক।

আমি বা আমার সঙ্গে খেলছি বা খেলেছি হচ্ছে। তুমি, তোমরা বা আপনির সঙ্গে খেলছে বা খেলেছেন হচ্ছে যার সে তাঁরা-র সঙ্গে খেলেছে বা খেলেছেন হচ্ছে।

অর্থাৎ পুরুষ বা পক্ষের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়ার রূপেরও পরিবর্তন ঘটছে। তাই তো?

ইয়াসমিনের কথাটাই দেখো আমি সাজিয়ে দিচ্ছি। ধরো ক্রিয়াটি হলো যাওয়া।

আমি-পক্ষ বা উত্তম পুরুষ	আমি যাচ্ছি।
তুমি-পক্ষ বা মধ্যম পুরুষ	তুমি যাচ্ছো। তুই যাচ্ছিস। তোমরা যাচ্ছো। তোরা যাচ্ছিস। আপনি যাচ্ছেন। আপনারা যাচ্ছেন।
সে-পক্ষ বা প্রথম পুরুষ	সে যাচ্ছে। ওরা যাচ্ছে। তিনি যাচ্ছেন। তাঁরা যাচ্ছেন।

দেখি ক্লাসের শেষ বেঞ্চি থেকে কৌশিক হাত তুলেছে, সে কিছু বলতে চায়।

কৌশিক বলল, এই লেখা থেকে দুটি জিনিস ধরতে পেরেছি। এক, বচনের কোনো প্রভাব ক্রিয়ার উপর পড়ে না। দুই সম্ভ্রমার্থে মধ্যম ও পুরুষের ক্রিয়ার রূপ একই হয়।

সারা ক্লাস তখন অবাক হয়ে তাকাল কৌশিকের দিকে।

হাতেকলমে

১.নীচের গদ্যাংশ থেকে পুরুষ বা পক্ষ চিহ্নিত করো :

১.১ পেটকাটা চাঁদিয়ালের কথা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, তোর বোঝাই সার, দেখা তো আর হচ্ছে না।

চাঁদিয়াল উত্তর দিল, ঠিক বলেছিস। একটু পরেই তোর সঙ্গে আমার প্যাঁচের লড়াই হবে। কেউ তো একজন ভোঁকাট্টা হয়ে হারিয়ে যাব। আকাশটা যদি আমাদের ঘর-বাড়ি হতো। আমরা যদি শুধুই আকাশে উড়তে পারতুম।

১.২ একটা আছে কাঠবেড়ালি
আমার দিকে তাকায় খালি
এদিক ওদিক টানতে থাকে আমায় —

যেই-না তাকে ধরতে যাব

ভুলিয়েদেয় সব হিসাবও

ছুট দেয় আর কেই-বা তখন থামায়।

১.৩ ‘ওরা নেমন্তন্ন করবে, দেখিস দাদা, কাল তো তালনবমী!’ ‘সে এমনিই নেমন্তন্ন করবে। তুই একটা বোকা!’

রাত্রে উত্তেজনায় গোপালের ঘুম হয় না। বাড়ির পাশের বড়ো বকুল গাছটার জোনাকির ঝাঁক জ্বলবে; জানলা দিয়ে সেদিক চেয়ে সে ভাবে— কাল সকাল হলে হয়। কতক্ষণে যে রাত পোহাবে!

২. ক্রিয়াররূপ অনুযায়ী শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ ——— আগামীকাল বেড়াতে যাবো।

২.২ ——— কি বাড়িতে আছেন?

২.৩ বিপ্লববাবু বলছিলেন যে ———— ভালো নেই, শরীর খারাপ।

২.৪ আমার কথা কি ——— শুনতে পাচ্ছিস?

৩. পুরুষ বা পক্ষ অনুযায়ী শূন্যস্থানে ক্রিয়া বসাও :

৩.১ আমরা এখন খুব ব্যস্ত ————।

৩.২ তুমি কি আমার কথা শুনতে ————?

৩.৩ আমি তোমাকে ————— যে বইটা তোমাকেই ————।

চিঠিপত্র

ক্লাসে ঢুকেই মনে পড়ল, চক আনতে ভুলে গেছি। জানলা দিয়ে দেখলাম দূরে কমনরুম থেকে সুবিমল আসছে। ওকে ইশারায় দাঁড়াতে বলে পকেট থেকে কাগজ বের করে চট্‌পট্‌ লিখে ফেললাম —

প্রিয়, সুবিমলবাবু, আমার জন্য দুটি চক এনো। —শ্যামল। কাগজটা ওদের সবাইকে দেখিয়ে, দ্রুত বলের মতো পাকিয়ে দরজায় গিয়ে ছোড়ামাত্রই; সুবিমলের হাতে। আমি ক্লাসে ফিরে এসে দেখি সকলে হাসছে।

‘বলো তো কী করলাম?’ — ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম।

‘কাগজের বল ছুড়লেন স্যার!’ — পল্টু বলল।

‘না স্যার, শুধু বল নয়; কী একটা লিখেছিলেন! সুবিমল স্যার পড়ছিলেন।’ — সুমনা বলল। সুজাতা বলল, ‘সুবিমল স্যারকে হাতচিঠি পাঠিয়ে, আপনি চক আনতে বললেন স্যার।’ দরজার কাছে গিয়ে সুবিমলের হাত থেকে চক নিয়ে এসে বললাম, ‘ঠিক বলেছ সুজাতা। পল্টু আর সুমনা তোমাদের কিন্তু আর একটু মন দিয়ে খেয়াল করা উচিত ছিল। যাইহোক। তাহলে চিঠি ব্যাপারটা সম্বন্ধে তোমরা জানো, তাই তো’! আবার পল্টু উঠে দাঁড়িয়েছে, ‘হ্যাঁ স্যার। বাবা দূরের বন্ধুদের বা জেঠু/কাকুদের খবর জানার জন্য চিঠি লেখেন।’

‘এবার তুমি একদম ঠিক বলেছ পল্টু। আমরা দূরে থাকা আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধবদের খবরাখবর জানতে বা খবরাখবর দিতে চিঠি লিখি।’ বলে কোণের দিকে তাকিয়ে দেখি স্নেহাশিস একটু উশখুশ করছে। — ‘তুমি কী কিছু বলবে স্নেহাশিস?’

‘স্যার, মা আমায় চিঠির গল্প বলেছে একটা!’

‘কীরকম শুনি?’

‘অনেক অনেক দিন আগে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চিঠি বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করত পাখিরা। তারপর পাখিদের বদলে সেই কাজ করত মানুষ। তাদের নাম ছিল ডাকহরকরা। ডাকহরকরা এক শহর থেকে অন্য শহর বা এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে চিঠি নিয়ে যেত। তবে

এখন ট্রেন, বাস কিংবা উড়োজাহাজে করে চিঠি যায় বিভিন্ন জায়গায়।’

স্নেহাশিস এত সুন্দর করে গুছিয়ে বলে যে, ওর প্রশংসা না করে পারি না— ‘বাহ্। খুব ভালো বলেছ।’ হঠাৎ মৌসুমি উঠে দাঁড়ায়, — ‘আমার কাকু কম্পিউটারেও চিঠি লিখতে পারে স্যার!’

‘হ্যাঁ, তার নাম ই-মেল বা ইলেকট্রনিক মেল। বাহ! তোমরা দেখছি সবই জানো। আসলে এযুগে প্রযুক্তির অনেক উন্নতি হয়েছে। তাই এখন ঘরে বসে অনেক দূরের বন্ধুকে এক লহমায় চিঠি পাঠানো যায় ইন্টারনেটের সাহায্যে। এই যে ধরো আমরা মোবাইল থেকে অন্যদের কাছে মনের কথা লিখে পাঠাই, সেও এক রকমের চিঠি। তাই নয় কি?’

সকলে সমস্বরে 'হ্যাঁ' বলে। —'তাহলে নিজের কথা দূরে কাউকে জানাতে এবং তার কথা জানতে আর বিভিন্ন প্রয়োজনে আমরা চিঠি লিখি, এটা আমরা সবাই জেনে গেছি। কিন্তু যার কাছে এটা পাঠানো হচ্ছে, যাতে সেই পায়; তেমন পাকা বন্দোবস্তটাও চিঠিতে থাকা দরকার।'

রিয়াজ এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল, এবার কিছু বলবে বলে উঠে দাঁড়াল—

'মোবাইলের মেসেজ ঠিক জায়গায় পাঠাতে যেমন ফোন নাম্বার, তেমনই চিঠির জন্য ঠিকানা লাগে স্যার।'

‘একদম ঠিক ধরেছ রিয়াজ। যে চিঠি লিখছে, যাঁর কাছে লিখছে; তাদের ঠিকানাগুলি ভালো করে উপযুক্ত জায়গায় লিখতে হয়। এসব ক্ষেত্রে ভুল হলেই মুশকিল ! স্নেহাশিস বলেছিল না পাখি আমাদের আদ্যিকালের পত্রবাহক। তাহলে চলো একটা পাখির ছবির সাহায্যে এবার আমরা চিঠির কাঠামোটাকে ভালো করে লিখে নিই’—

ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ আপাতত শেষ।— কী, তাহলে বন্ধুবান্ধবের চিঠি লেখার কৌশলটা আমরা বুঝতে পারলাম, তাই তো! এবার এই একইভাবে যখন আমরা বড়োদের বা ছোটোদের কিংবা সম্মাননীয় অন্য কাউকে চিঠি লিখি, তখন উপরের কাঠামো একই রাখব। শুধু কয়েকটা জায়গা বদলাতে হবে, চলো সকলে মিলে করি—

চিঠি লেখার কায়দাকানুন :

প্রারম্ভিক সম্বোধন বা সম্ভাষণ (চিঠির মাথায় বামদিকে)

প্রিয় বন্ধু,
অজন্তা

যে চিঠি লিখছে বা চিঠি প্রেরকের ঠিকানা ও তারিখ (চিঠির মাথায় ডানদিকে)

ডাক + গ্রাম - সোনামুখী
জেলা - বাঁকুড়া
২২ আগস্ট, ২০১৪

চিঠির মূল অংশ

অনেকদিন তোমার কোনো চিঠি পাইনি। লেখাপড়ার ব্যস্ততায় দূরের বন্ধুটিকে ভুলে গেলে নাকি? আমার কিন্তু তোমার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। তোমাদের বাড়ি থেকে দলবেঁধে লালগড় বেড়াতে যাওয়ার কথা মা-বাবা খুবই বলেন। আমারও এখন পুরোদমে ক্লাস চলছে, সঙ্গে গান আর খেলা তো আছেই। আর বিশেষ কী? এখানে আমরা সকলে ভালোই আছি। কাকু-কাকিমণি এবং অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম জানালাম, তোমার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা।

ইতি
তোমার বন্ধু
শ্রীরূপা

সমাপ্তিবাচন এবং চিঠির লেখকের নাম (চিঠির শেষে ও নীচে ডানদিকে)

অজন্তা নন্দী
অনন্ত নন্দীর প্রযত্নে
কলেজ পাড়া
পঃ মেদিনীপুর
সূচক-৭২১১০১

যেখানে বা যার কাছে চিঠি পাঠানো হচ্ছে বা চিঠি প্রাপকের ঠিকানা (চিঠির শেষে বামদিকে)

চিঠির উপরে বাম দিকে সম্বোধন বা সম্ভাষণ :

- বন্ধু বা সমবয়স্কদের ক্ষেত্রে — প্রিয় বা প্রিয়বন্ধু, ভাই, বন্ধুবর, প্রিয়বরেষু, বন্ধুবরেষু, সুহৃদ ইত্যাদি।
- বয়সে বড়ো গুরুজনদের ক্ষেত্রে— শ্রী চরণেষু, পরম পূজনীয়/পরম পূজনীয়া, পূজনীয়/পূজনীয়া, শ্রদ্ধেয়/শ্রদ্ধেয়া, মাননীয়/মাননীয়া, পাকজনাবেষু, মোবারকজনাবেষু ইত্যাদি।
- বয়সে ছোটোদের ক্ষেত্রে— কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া, স্নেহভাজন, প্রীতিভাজন ইত্যাদি।

সুকল্যাণ উঠে দাঁড়ায়, — 'স্যার এভাবে তাহলে চিঠির সমাপ্তি অংশটাও একটু বদলাতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।'— 'চিঠির শেষে ডানদিকে সমাপ্তি অংশটি হবে'—

- বন্ধু বা সমবয়স্কদের ক্ষেত্রে — ইতি তোমার বন্ধু, ইতি প্রীতিধন্য প্রভৃতি।
- বয়সে বড়ো গুরুজনদের ক্ষেত্রে — ইতি প্রণত, আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী, খাকসার প্রভৃতি।
- বয়সে ছোটোদের ক্ষেত্রে — শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভার্থী, শুভানুধ্যায়ী প্রভৃতি।

এই যে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক চিঠির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। এবার তাহলে খুব সংক্ষেপে সকলে মিলে চিঠির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো বলো দেখি—

- চিঠির উপরে ডান দিকে নিজের কিংবা যে লিখছে তার ঠিকানা — সম্পূর্ণা বলে।

- চিঠির উপরে বাম দিকে বয়স এবং সম্পর্ক অনুযায়ী সম্ভাষণ বা সম্বোধন—রজতের সংযোজন।

- পল্টু বলে, এবার বিষয় অনুসারে চিঠির মূল বক্তব্য।

- তারপর শেষে ডানদিকে আবার বয়স এবং সম্পর্ক অনুসারে সমাপ্তিবচন — যোগ করে জয়িতা।

- আর বাঁ দিকে যেখানে বা যাকে পাঠানো হচ্ছে সেখানকার বা তাঁর ঠিকানা, ব্যাস চিঠি শেষ।

'বাহ! সবাই খুব ভালো বলেছ। তাহলে এবার চিঠি লেখার পালা'—

এক। বন্ধুর চিঠির প্রত্যুত্তর :

দেবীবাড়ি
কোচবিহার
সূচক-৭৩৬১০১
১৬ মে, ২০১৪

প্রিয় বন্ধু,

নীলাদ্রি,

গতকাল তোর চিঠি পেলাম। কিছুদিন আগে তোর বিদ্যালয়ে হয়ে যাওয়া পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠানের কথা পড়ে খুব ভালো লাগল। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মহলাগুলো যখন চলে, তখন যেন গোটা স্কুলটা জেগে ওঠে। কত আয়োজন ব্যস্ততা কী ভালো লাগে! আমার এখানে এবার ওই দিন 'ডাকঘর' মঞ্চস্থ হলো। আমার বন্ধু

পিকলুকে তুই তো চিনিস, ও ‘অমল’ হয়েছিল। এত ভালো অভিনয় করেছে যে অনেকে ওকে এখনও ‘অমল’ বলে ডাকছে। আমি এবার নাটকে ছিলাম না, ছিলাম গানের দলে। সবমিলিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটিও বেশ ভালো হয়েছিল। যাইহোক, আর কয়েকদিন পরেই গরমের ছুটি। কাকু-কাকিমার সঙ্গে সম্ভব হলে আমাদের এখানে চলে এসো। বাড়ির বড়োদের আমার প্রণাম দিও। তোমার জন্য অনেক ভালোবাসা। আজ এখানেই শেষ করলাম।

নীলাদ্রি বসু　　　　　　　　　　ইতি
শীর্ষেন্দু বসুর প্রযত্নে　　　　　তোমার বন্ধু
১৩১ মধুগড় বাজার　　　　　　　শুভ্র
কলকাতা — ৭০০০৩০

দুই। বিদ্যালয় ছাত্রাবাস থেকে মাকে লেখা চিঠি

বিবেকানন্দ শিক্ষায়তন
ছাত্রাবাস
শিবপুর, হাওড়া
সূচক-৭১১১০১
৩০.০১.২০১৪

পূজনীয়া মা,

তোমার চিঠি পেয়েছি। শীতের ছুটির পর, এখানে এসে থেকে আর তোমাকে চিঠি লেখা হয়নি বলে অভিমান করেছ। আসলে নতুন ক্লাসের বই-পত্র, লেখা-পড়া নিয়ে একটু চাপে ছিলাম। এছাড়া একইসঙ্গে আমাদের হস্টেলে ইন্টার হাউস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলছিল, সুতরাং বুঝতেই

পারছ। তবে কোনো অজুহাতে দেবো না, প্রায় মাসখানেক চিঠি দেওয়া হয়নি বলে ক্ষমা চাইছি। আর কখনও এরকম হবে না। আমি এখানে ভালো আছি। একদম চিন্তা করবে না। বাবা কি এর মাঝে বাড়ি এসেছিল? পরের বার আসার সময় আমার জন্য মেলা থেকে কেনা বইগুলি অবশ্যই নিয়ে আসবে। এখন আর সময় নেই। এবার ঘরের আলো বন্ধ হবে। ঘুমোতে চললাম। তোমাদের এবং দিদুনকে আমার প্রণাম জানাই।

শ্রীমতী অঞ্জলি সেনগুপ্ত ইতি

গোলাপবাগ তোমার বুবাই

বর্ধমান

সূচক-৭১৩১৪৪

তিন। বোনকে লেখা দাদার চিঠি

তমলুক
পূর্ব মেদিনীপুর
সূচক-৭২১৬৩৬
২৭.০৫.১৪

স্নেহের পূজা,

তোরা কেমন আছিস? কাকু এখান থেকে বদলি হয়ে চলে যাওয়ার পর আমার খুব মন খারাপ করে। তুই না থাকায় বাড়িতে আমার কোনো খেলার সঙ্গী নেই। সারাক্ষণ একা একা খেলতে হয়। তবে আমাদের পোষা লালি ছাগল আর কুকুর বুলো রোজ আসে। দেখে মনে হয় ওরাও তোকে খোঁজে। আমি ওদের বুঝিয়েছি যে

সামনের গরমের ছুটিতেই তোরা আসবি। আমি চৈত্রের মেলা থেকে তোর জন্য একটা পুতুল কিনে রেখেছি। এবার বাগানের গাছদুটোয় অনেক আম হয়েছে। এলে দেখবি কী সুন্দর যে লাগছে! আশাকরি কয়েকদিন পরেই দেখা হবে। তোর নতুন স্কুল কেমন লাগছে। যাইহোক আজ এখানেই শেষ করছি। কাকু আর কাকিমাকে আমার প্রণাম আর তোকে জানাই ভালোবাসা।

পূজা পাঠক   ইতি

প্রকাশ পাঠকের প্রযত্নে   তোর দাদা

আনন্দ ভবন,   প্রিয়ম

শান্তিনিকেতন রোড,

বোলপুর

সূচক-৭৩১২০৪

চার। বাবাকে মায়ের অসুস্থতার কথা জানিয়ে চিঠি

নতুনবাজার
বারুইপুর
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
সূচক-৭০০১৪৪
১৩.০৭.২০১৪

শ্রীচরণেষু বাবা,

আশা করি তুমি ভালো আছ। আমরা এখানে ভালোই ছিলাম, কিন্তু গত পরশু থেকে মায়ের শরীরটা একটু খারাপ। মাঝে মধ্যেই জ্বর আসছে সঙ্গে মাথায় খুব ব্যথা। আমরা গতকাল ডাক্তারকাকুর কাছে গিয়েছিলাম। উনি বললেন দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ওষুধ দিয়েছেন। তুমি বেশি

দুশ্চিন্তা কোরো না। মা দুয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে যাবে। আমি ভালো আছি। পুরোদমে লেখাপড়া চলছে। জানো এবার আমরা জেলা ফুটবল চাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছি। সামনের শনিবার খেলা। স্যার চুটিয়ে প্র্যাকটিস করাচ্ছেন। আমরাও জেতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। দেখা যাক কী হয়। ওই মা খেতে ডাকছে। তাহলে আজ এখানেই শেষ করলাম।

প্রণবেশ হাজরা
কলেজপাড়া
জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর
সূচক-৭২১১০১

ইতি
প্রণত শুভ

১.ছাত্রাবাসে লেখাপড়া কেমন চলছে জানিয়ে বাবা ও মাকে একটি চিঠি লেখো।

২.বিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠানের কথা সংক্ষেপে জানিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।

৩.গরমের ছুটি কেমন কাটালে জানিয়ে দূর থেকে লেখা ভাইয়ের চিঠির প্রত্যুত্তর দাও।

৪.পরীক্ষা কেমন হয়েছে জানিয়ে দিদিকে একটি চিঠি লেখো।

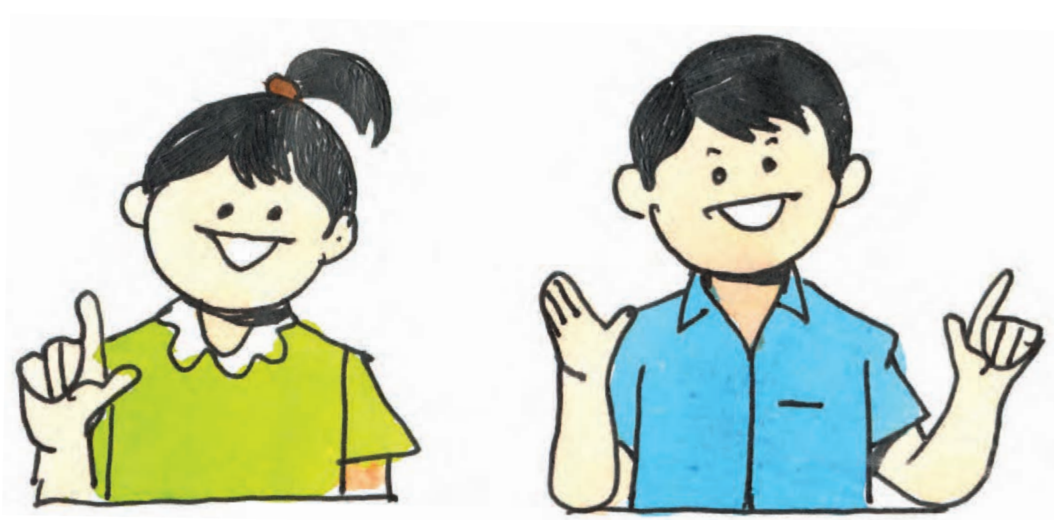

বিপরীত শব্দ

ক্লাসে সেদিন হই-চই নেই, অস্বাভাবিক নীরবতা। আমি ঢুকে বললাম , 'কী ব্যাপার ? ফাইভের বদলে অন্য কোনো ক্লাসে ঢুকে পড়লাম নাকি ?' তাতেও সবাই চুপ। হলোটা কী? সেকেন্ড বেঞ্চে বসে অতনু। তাকে বললাম,'শান্ত হয়ে গেলে কেন অতনু ? কী হয়েছে ? অন্যান্য দিন তো দুষ্টুমি করো, ছটফট করো...' অতনু দু-চোখ ভর্তি জল নিয়ে বলল, 'কাল ক্লাস ফোরের কাছে দু-গোলে হেরেছি স্যার। সেমিফাইনালে। ' বোঝো কাণ্ড! নীচু ক্লাসের কাছে হেরে অপমানবোধে একেবারে নিঝুম হয়ে গেছে গোটা ক্লাসটা!

সামলাবার চেষ্টা করতেই হলো। বললাম, 'খেলায় তো হারজিত থাকেই। পরেরবার নিশ্চয়ই জিতবে। ক্লাস ফোর নিশ্চয়ই ভালো খেলেই

জিতেছে। বিপরীতে যেই থাকুক , উঁচু ক্লাস বা নীচু ক্লাস --- যে ভালো খেলবে তারই তো জেতা উচিত। তাই না?’ পিছনের বেঞ্চ থেকে সুজয় বলল, ‘এখনো বোর্ডটা ঝুলছে স্যার। স্কোর ক্লাস ফাইভ -০ আর উলটোদিকে ক্লাস ফোর-২। তাকাতে পারছি না।’ কথা শেষ না হতেই চট্ করে বলে উঠল প্রমা, ‘তোর তো খারাপ লাগবেই। গোলকিপার সলিলকে সবাই দোষ দিচ্ছে এত। তোর সব থেকে কাছের বন্ধু ।’ সামসুল এবার গলা তুলল, ‘ক্লাস ফোরের অগ্নি দু-দুটো গোল দিয়ে যাবে! দুটোই আলতো শট। সলিল বাজে গোল খেয়েছে। ওর তো দোষ আছেই।’ আমি বললাম , ‘বা বেশ মজার ব্যাপার তো। অগ্নিতে সলিল পরাজিত।

উলটোটাই তো হবার কথা।' একটু থমকে গেল সামসুল। 'কেন স্যার ? ঠিক বুঝলাম না।' অন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখি, সবার চোখেই না-বোঝার দৃষ্টি। একটু খোলসা করে বললাম তখন, 'আরে সলিল মানে কী ? জল। আর অগ্নি মানে ? আগুন; অর্থাৎ আগুনের সামনে জল এলে তো আগুনই নিভে যাবার কথা । তা হলো না, বরং অগ্নির কাছে দু-দু-বার পরাস্ত হলো সলিল।' এবার সবাই হেসে ফেলল। সলিল উঠে বলতে লাগল, 'দুটো গোলই স্যার অফসাইডে হয়েছে।' ধমক দিয়ে উঠল রবিউল, 'বাজে কথা বলছিস। তুই বলের ফ্লাইট মিস করেছিস। অগ্নি অন্‌সাইড ছিল। আমি তখন ফরোয়ার্ড থেকে পেনাল্টি বক্সে নেমে এসেছি।' আমি দেখলাম তর্ক বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে। বললাম, 'দাঁড়াও দাঁড়াও । আজ একটা শব্দ আর তার বিপরীত শব্দ বলছ একেকজন।

খেলার মাঠ থেকে এবার ক্লাসে ফিরে এসো তো সবাই। আজ বিপরীতার্থক শব্দ নিয়েই কথা বলা যাক । থার্ড বেঞ্চের দিকে সবাই তাকাও। কেমন নিশ্চিন্তে পাশাপাশি বসে আছে চঞ্চল আর প্রশান্ত। একেবারে পরস্পর বিপরীত শব্দ, কিন্তু ওদের বন্ধুত্বে তার কোনো প্রভাব পড়েনি। এতক্ষণে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছে অতনু। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, ‘বুঝেছি স্যার। এটা তো ভাবিনি! নামে ওরা তো একে অন্যের উলটোটা। ওরা আমাদের দুই মিডফিল্ডার ।হারব না তো কী জিতব? উলটো নামের প্লেয়ার হলে তো উলটো ফল হবেই! ’ রবিউল মাথা নেড়ে বলল ‘ধুস্। এজন্য কেউ হারে নাকি? আমি

বললাম, ‘সকলে নামের মানেটা বুঝেছ তো? চঞ্চল শব্দের অর্থ হলো ছটফটে আর প্রশান্ত শব্দের মানে হলো ধীর স্থির। সেজন্যই ওদের নামের মানে দুটো বিপরীত।’ ফার্স্ট বেঞ্চের কোণ থেকে রাবেয়া প্রশ্ন করল , ‘গতবছর আপনি যেমন প্রতিশব্দ নিয়ে একটা খেলা শিখিয়েছিলেন , প্রতিশব্দ খোঁজার খেলা। এবার কি বিপরীত শব্দ খোঁজার খেলা হবে?’ আমি বললাম, ‘দারুণ বলেছ। তবে, পার্থক্য একটা রয়েছে। তোমাদের বলেছিলাম, এককেটা শব্দের অনেক প্রতিশব্দ হতে পারে। তার মধ্যে থেকে দুটি শব্দ দু-সপ্তাহে শিখতে বলেছিলাম। কিন্তু, বিপরীত শব্দ একটা শব্দের একটাই জানতে হবে।’

সামসুল বলল, ‘সব শব্দের কি বিপরীত শব্দ হয়?’ আমি বললাম, ‘এটা খুব ভালো প্রশ্ন। সব শব্দের যে বিপরীত শব্দ থাকবে এমন নয়। সব

শব্দের কি উলটো শব্দ থাকে?’ রাবেয়া বলল, ‘ বিপরীত শব্দ কি সামনে ‘অ’ লাগালে পাওয়া যাবে? যেমন জানার উলটো অজানা, সৎ এর বিপরীত অসৎ।’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ। তবে সবসময় এরকম হয় না। লম্বার উলটো নিশ্চয়ই অলম্বা নয়, হবে বেঁটে বা খাটো।

আবার, গুণ আর নির্গুণ, সুখ্যাতির উলটো কুখ্যাতি। একটু ভেবেচিন্তে, বাংলাভাষায় শব্দভাণ্ডারের অফুরন্ত সম্ভার থেকে বেছে বিপরীত শব্দ খুঁজতে হবে।’

প্রমা এবার অনেকক্ষণ পর বলল, ‘ মাথা খাটাতে হবে। আগে ‘অ’ দিয়ে বা ‘নি’ দিয়ে সব শব্দের বিপরীত পাওয়া যাবে না। আমরা রোজ

যেসব শব্দ মুখে বলি বা লিখি, তার মধ্যে থেকে ঠিকঠাক প্রচলিত শব্দ খুঁজতে হবে।’

প্রশান্ত বলল, ‘ঠিক বলেছিস। উদ্ভট শব্দ তৈরি করলে হবে না। আমার বোন তিনবছর বয়সি। সে একদিন হাতি দেখে বলেছে সামনের লেজটা বেশি লম্বা! ওটা শুঁড় সেটা ওর জানা নেই।’

আমি বললাম, ‘সেটা ঠিক। তবে, মাথা খাটানোর কোনো বিকল্প নেই। সবসময় শব্দটা বুঝে তার বিপরীত শব্দটা খুঁজতে হবে। যদি বলি ‘উত্তর’-এর বিপরীত শব্দ কী? পারবে তোমরা?’

সুজয় বলল, ‘দক্ষিণ’ আর অবন্তী বলল, ‘প্রশ্ন’। আমি বললাম , ‘সাবাস! দুজনেই ঠিক। এবার, দেখতে হবে, ঠিক কোনটা চাওয়া হয়েছে। নইলে দুটোই হবে।’

হাত তুলেছে প্রশান্ত। বললাম, ‘বলো’। প্রশান্ত বলল, ‘কটা বিপরীত শব্দ প্রতিমাসে জানতে হবে?’

আমি বললাম, ‘সংখ্যা দিয়ে সবসময় দেখো না। বরং তোমার বাংলা বই ‘পাতাবাহার’-এর যখন যে লেখা পড়া হচ্ছে তার থেকে তালিকা তৈরি করে, বিপরীত শব্দ জেনে নাও। তাতে শব্দভাণ্ডারও বাড়বে আবার পাঠ্যবইটাও মন দিয়ে পড়া হয়ে যাবে।’

সলিল বলল, ‘আপনি প্রতিশব্দ শেখানোর সময় কয়েকটি শব্দ আর প্রতিশব্দ বোর্ডে লিখে দিয়েছিলেন। এবার দেবেন না?’ আমি বললাম, না। বরং এসো, একটা খেলা খেলি। ডানদিকের বেঞ্চ বনাম বাঁ দিকের বেঞ্চ। রাবেয়া পাঁচটা শব্দ লেখো বোর্ডে। এবার বাঁ-দিকের বেঞ্চগুলো থেকে অতনু তুমি উঠে এসে বিপরীত শব্দগুলো লেখো।’

রাবেয়া আর অতনু দারুণ খেললো। দু-দলেরই স্কোর হলো : ৫- ৫।

রাবেয়ার লেখা শব্দ	অতনুর লেখা বিপরীত শব্দ
দিন	রাত
বৃদ্ধি	হ্রাস
নবীন	প্রবীণ
স্বাধীন	পরাধীন
স্থির	অস্থির

আমি বললাম, এই খেলাটা এখন কয়েকদিন চলবে। শেষে দেখা যাক, কে জেতে কে হারে। তবে, নীচু ক্লাসের হাতে হারার ভয় নেই।

কয়েকদিন ক্লাসে যে খেলা হয়েছিল, সেই শব্দ এবং বিপরীতার্থক শব্দের তালিকা :

শব্দ		**বিপরীত শব্দ**
অজ্ঞ	—	বিজ্ঞ
কঠিন	—	কোমল
ধ্বংস	—	সৃষ্টি
আকাশ	—	পাতাল
অগ্রজ	—	অনুজ
জোয়ার	—	ভাটা
উন্নতি	—	অবনতি

শব্দ — বিপরীত শব্দ

ছোটো — বড়ো

অনুকূল — প্রতিকূ

জ্ঞানী — মূর্খ

উচিত — অনুচিত

পাপ — পুণ্য

খাদ্য — অখাদ্য

আদান — প্রদান

আয় — ব্যয়

একাল — সেকাল

ইচ্ছা — অনিচ্ছা

দীর্ঘ — হ্রস্ব

শব্দ	—	বিপরীত শব্দ
চঞ্চল	—	শান্ত
কুটিল	—	সরল
শুভ	—	অশুভ
আবাহন	—	বিসর্জন
জন্ম	—	মৃত্যু
গ্রাম্য	—	শহুরে
বেশি	—	কম
উত্থান	—	পতন
ঐক্য	—	অনৈক্য
ঈষৎ	—	অধিক
দেশ	—	বিদেশ

শব্দ	—	বিপরীত শ
নীরস	—	সরস
ভয়	—	সাহস
ঘন	—	তরল
অভদ্র	—	ভদ্র
দুর্বল	—	সবল
চেতন	—	অচেতন
সত্য	—	মিথ্যা

বিক্রেতা ক্রেতা

ঠান্ডা গরম

শীত

গ্রীষ্ম

হাতেকলমে

১.নীচের শব্দগুলির সঙ্গে বিপরীত শব্দগুলি মেলাও :

শব্দ	বিপরীত শব্দ
টাটকা	মৌলিক
যত্ন	অশান্তি
খাঁটি	অনৈক্য
ঐক্য	বাসি
ঋজু	অমঙ্গল
শান্তি	ভেজাল
যৌগিক	অযত্ন
মঙ্গল	বক্র

২.নীচের শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লেখো এবং সেই শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করো :

তরুণ	গরম	পাপ
আলো	ছোটো	প্রবেশ
অশুভ	উন্নত	উঁচু

৩.নীচের বাক্যগুলিতে চিহ্নিত শব্দগুলির পরিবর্তে বিপরীত শব্দ লেখো :

৩.১ এই রাস্তা সোজা ভাবে গেছে।

৩.২ অঙ্কটা খুব সোজা।

৩.৩ এটাই আমার উত্তর।

৩.৪ পুকুরের উত্তর কোণে রয়েছে এক পাথরের মূর্তি।

৪.শব্দ ও তার বিপরীত শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে বাক্যে প্রয়োগ করো :

১.সঞ্জয়দার মাথাভরতি কাঁচাপাকা চুল।

২. ....

৩. ....

৪. ....

৫. ....

৬. ....

৫.বিপরীত শব্দ লেখো :

রাত্রি, আনন্দ, উর্বর, দীর্ঘ, ভোঁতা, অপক্ক, সচল, নিঃশব্দ, অনর্থ, অপব্যবহার, উপকার, অলস, উষ্ণ

অনুচ্ছেদ রচনা

বাংলার উৎসব

কথায় আছে বাংলার 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'। উৎসব ও পার্বণের দিনগুলোতেই বাঙালির প্রাণের প্রকৃত পরিচয় ফুটে ওঠে। নানান ধর্মের মানুষ বছর জুড়ে নানান সময়ে তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপন করে থাকেন। বাঙালির সবচেয়ে বড়ো উৎসব দুর্গাপূজা ও ইদ। হিন্দুদের মধ্যে পালিত হয় লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা,

বিশ্বকর্মাপূজা, মনসাপূজা, ধর্মপূজা প্রভৃতি। মুসলিম সম্প্রদায়ের উৎসবগুলির মধ্যে রয়েছে মহরম, ইদ, সবেবরাত ইত্যাদি। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা পালন করেন খ্রিস্টজন্মদিবস, গুড ফ্রাইডে, ইস্টার স্যাটারডে প্রভৃতি উৎসব। এইসব উৎসব ছাড়াও বাঙালির সামাজিক উৎসবের মধ্যে অন্নপ্রাশন, জন্মদিন, বিবাহ, বিভিন্ন ব্রত-পার্বণ রয়েছে। এছাড়াও বাঙালি নবান্ন, পৌষপার্বণ, দোলযাত্রা, নববর্ষ প্রভৃতি উৎসবে শামিল হয়। স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, নেতাজি জয়ন্তী প্রভৃতি দিনগুলিকে বাঙালিরা জাতীয় উৎসব রূপে পালন করে থাকেন। এইসব উৎসবের মধ্যে দিয়েই মানুষে মানুষে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সুদৃঢ় হয় সামাজিক বন্ধন।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

আমাদের বিদ্যালয়ে একটি বড়ো ও পুরোনো গ্রন্থাগার আছে। স্কুলের প্রতিষ্ঠার বছরেই, অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে গ্রন্থাগারটি গড়ে ওঠে। আমরা এখানে বসে পড়াশুনো করার সুযোগ যেমন পাই, তেমনই আবার কার্ড জমা রেখে বাড়িতেও পড়ার জন্য বই নিতে পারি। বহু পুরোনো ও নতুন বই রয়েছে আমাদের গ্রন্থাগারে। রয়েছে ছোটোদের জন্য নানান পত্রপত্রিকা। গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ দেখতে এখন আর আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। গ্রন্থাগারিক স্যারও আমাদের বই খুঁজে নিতে

সাহায্য করেন। বই যত্নসহকারে ব্যবহার করে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখি, বাড়িতে নিয়ে যাওয়া বই ফেরত দিই সময়মতো। এমন বইয়ের সংগ্রহ আমি আর কোথাও দেখিনি। আমাদের গ্রন্থাগারের দেয়ালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উদ্ধৃতি রয়েছে --- 'লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানবহৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যে-দিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।' আমাদের 'পাতাবাহার' বইয়ের শেষে 'বই পড়ার ডায়েরি' অংশে আমার পড়া সব বই নিয়ে সংক্ষেপে লিখে রাখি।

গাছ আমাদের বন্ধু

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সে পায় গাছ থেকে। সমাজে এখনও বহু গাছকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করা হয়ে থাকে। এই গাছই মানুষকে প্রখর রোদে ছায়া দেয়, ফুল-ফলের সমারোহ সাজিয়ে তোলে। শুকনো পাতা ও ভেঙে যাওয়া গাছের ডালকে মানুষ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। বহু জীবনদায়ী ওষুধের উৎসও এই গাছ। শুধু তাই নয়, আসবাবপত্র তৈরি ও গৃহনির্মাণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিল্পসামগ্রী তৈরিতেও আমরা গাছের উপর

অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। বিকল্পের অনুসন্ধান না করে নির্বিচারে গাছ কেটে মানুষ ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে তার এই যথার্থ বন্ধুকে। তার বিষময় ফলও ভোগ করে চলছে প্রতিনিয়ত। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে বসেছে। বাড়ছে ভূমিক্ষয়, তাপমাত্রা, নষ্ট হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। আর দেরি নয়। আমাদের সকলকে শপথ নিতে হবে আমাদের প্রিয় বন্ধু গাছকে রক্ষা করার।

জগদীশচন্দ্র বসু

ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বসু। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের আদি নিবাস ছিল ঢাকার রাড়িখাল গ্রামে। তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু, মা বামাসুন্দরী দেবী। পিতার কর্মক্ষেত্র ফরিদপুরে

জগদীশচন্দ্রের বাল্যশিক্ষার সূচনা হয়। পরে তিনি কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজে লেখাপড়া করেন। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্নাতক হন। তিনি এরপর

কেম্‌ব্রিজ থেকে বিজ্ঞানে অনার্সসহ বি.এ. এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি. পাশ করেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ডি.এসসি. উপাধি অর্জন করেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ‘এমেরিটাস অধ্যাপক রূপে তিনি অবসর নেন

এবং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ‘বসুবিজ্ঞান মন্দির’ প্রতিষ্ঠা করেন। ফোটোগ্রাফি ও শব্দগ্রহণ, বৈদ্যুতিক চুম্বক তরঙ্গ বিষয়ে গবেষণা, বিনা তারে বার্তাপ্রেরণের পদ্ধতি আবিষ্কার, মানুষের স্মৃতিশক্তির যান্ত্রিক নমুনা প্রস্তুতি, শারীরবিদ্যা-বিষয়ক গবেষণা প্রভৃতি তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। এছাড়াও তিনি স্ফিগ্‌মোগ্রাফ, পোটোমিটার প্রভৃতি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে ঘুরে বহু মন্দির ও প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ধ্বংসাবশেষের স্থির চিত্র গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। তাঁর লেখা ‘অব্যক্ত’ বইটি বিখ্যাত। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ‘বিজ্ঞানাচার্য’ ও ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ‘স্যার’ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর গিরিডিতে তিনি পরলোক গমন করেন।

হাতেকলমে

তোমরা অনুচ্ছেদের কয়েকটি নমুনা পড়লে। এবার নীচে দেওয়া সংকেতগুলি অনুসরণ করে অনুচ্ছেদ লেখো :

১. তোমার দেখা একটি মেলা — কবে, কোথায়, কখন বসে— কার/কাদের সঙ্গে, কীভাবে তুমি মেলায় পৌঁছালে— কী কী দেখলে— মেলা কেমন লাগল— বিশেষ কোনো ঘটনার পরিচয় — ফিরে আসা।

২.একটি গ্রাম/শহরের আত্মকথা— কোন গ্রাম/ শহর — তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়— পুরোনো কোনো ঘটনা— সময় কীভাবে বদলে গেল—।

৩.একটি বৃষ্টির দিন— বৃষ্টির পূর্বাভাস— ঝড়ের তাণ্ডব--- সারাদিন তুমি যা যা করলে--- তোমার যেমন লাগল।

৪.ছুটির দিনে বনভোজন— পরিকল্পনা করা ও বনভোজনে বেরোনো— সঙ্গীদের কথা— কোথায় হলো বনভোজন--- স্থানটির পরিচয়— কী কী খাওয়া হলো— কীভাবে সারাদিন কাটালে— কীভাবে ফিরলে।

৫.তোমার প্রিয় বই— কোন বইটি কেন তোমার প্রিয়— লেখক কে?— তাঁর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা— বইটির কোন বিশেষত্ব তোমার নজর কেড়েছে— লেখকের আর কোন্ বই তুমি কীভাবে পড়তে চাও।

৬.বিদ্যালয় জীবনে খেলাধুলার ভূমিকা--- লেখাপড়া ও খেলাধুলা--- চরিত্রগঠন ও অন্যান্য গুণের বিকাশে খেলাধুলা--- বিদ্যালয়ে কোন কোন খেলা তুমি খেলতে পারো।

৭.একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা: পূর্বপ্রস্তুতি— যাত্রা শুরু--- পথের অভিজ্ঞতা--- ভ্রমণস্থানের পরিচয় ও বিবরণ— ফিরে আসা।

শিখন পরামর্শ

চতুর্থ শ্রেণির ব্যাকরণ বই 'ভাষাপাঠ'-এর মতো করেই প্রস্তুত করা হলো পঞ্চম শ্রেণির বইটিও। এখানেও বাংলা ব্যাকরণের নানা দিক আলোচিত হলো কথোপকথনের মাধ্যমে।

পঞ্চম শ্রেণিতে প্রথমেই এসেছে ব্যঞ্জনসন্ধির কথা। চতুর্থ শ্রেণিতে স্বরসন্ধি এবং ব্যঞ্জনসন্ধির প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। ব্যঞ্জনসন্ধির কথায় চতুর্থ শ্রেণির এই দুটি বিষয় নিয়ে আবার আলোচনা করে নেওয়াই ভালো। 'শব্দ ও পদ' অধ্যায়টি পরবর্তী ক্লাসগুলোয় অনেক বিস্তারিতভাবে আসবে। এই শ্রেণিতে শুধু সূচনাটুকু থাকল। তাই বিশেষ্য বা ক্রিয়া বা অব্যয়ের প্রকারভেদগুলি এখানে উল্লেখ করা হলো না। লিঙ্গ, পুরুষ ও বচন আলোচনায় উদাহরণের উল্লেখ থাকলেও আরো উদাহরণ দিয়ে ও হাতেকলমে অনুযায়ী আরো অনুশীলন করা যেতে পারে। বিপরীত শব্দ নিয়েও একই কথা বলা যেতে পারে। চিঠিপত্র ও অনুচ্ছেদের কয়েকটি নমুনা রইল। রইল হাতেকলম অংশে কয়েকটি চিঠি ও অনুচ্ছেদের কথাও।

প্রতিটি পাঠের শেষে যে 'হাতেকলমে' আছে, সেটি শুধুই নমুনা। এরকম অনেক কাজ আপনারা তৈরি করে ছাত্রছাত্রীদের সামনে রাখুন। নিয়মিতভাবে লিখতে দিন অনুচ্ছেদ, বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ে। চর্চা করুন বিপরীত শব্দ নিয়েও। এক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণির 'পাতাবাহার' বইটি ব্যবহার করুন।

ব্যাকরণপাঠের মধ্যে যে যান্ত্রিকতা আছে, তা থেকে মুক্ত করার জন্য, ভাষার নিয়মকে বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে বিষয়টিকে সরস ও আনন্দময় করে তোলার জন্য আমরা এই বিশেষ পদ্ধতিতে পাঠগুলি বিন্যস্ত করেছি। পাশাপাশি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতিগুলিও অনুসরণ করা হয়েছে। আমরা চেয়েছি ভাষাপাঠের ক্লাস মুখস্থবিদ্যা আর যান্ত্রিক অনুশীলনের পরিবর্তে যেন হয়ে ওঠে যুক্তিনির্ভর আর বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনাসাপেক্ষ আর সব মিলিয়ে অবশ্যই চিত্তাকর্ষক।